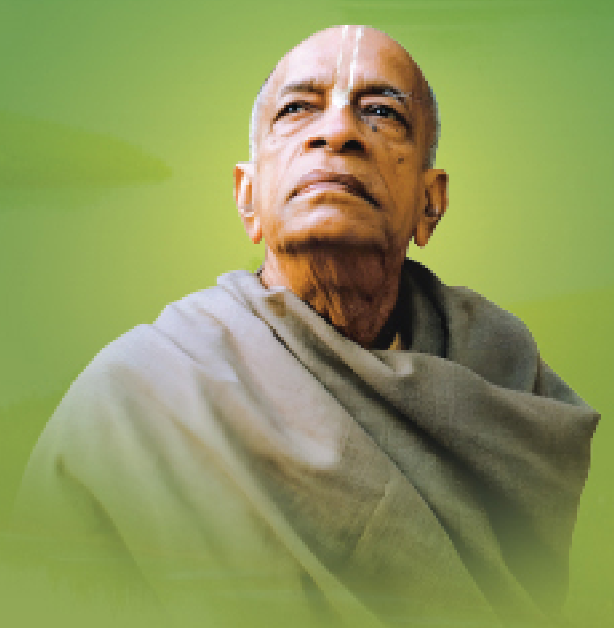

এই শিশুরা হচ্ছে আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ আশা, তাই এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে কিভাবে আমরা তাদেরকে খুব ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণভাবনায় প্রশিক্ষিত করছি।

-শ্রীল প্রভুপাদ
(সৎ স্বরূপকে পত্র ১১ এপ্রিল ১৯৭৩)

ISKCON BANGLADESH | JAGRATA CHATRA SAMAJ ISKCON, BANGLADESH

পরিচালনায়ঃ জাগ্রত ছাত্র সমাজ

আয়োজনেঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন), বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যঃ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

officialjcsbd | iskconjcsbd@gmail.com | jcsdhaka | www.jcsdhaka.com

ISKCON®
MINISTRY OF EDUCATION

JAGRATA CHATRA SAMAJ
ISKCON, BANGLADESH

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পূর্তিতে

ভক্তিবেদান্ত মেগা কনটেস্ট-২০২৬

গ-বিভাগ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)

জাগ্রত ছাত্র সমাজ

স্বামীবাগ আশ্রম, ৭৯ স্বামীবাগ রোড, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪।

HOTLINE +880 1323-997755

উৎসর্গ

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য:
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এর করকমলে

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পূর্তিতে
ভক্তিবেদান্ত মেগা কনটেস্ট-২০২৬

উপদেষ্টা মণ্ডলী:

শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ
শ্রীমৎ ভক্তি অদ্বৈত নবদ্বীপ স্বামী মহারাজ
শ্রীমৎ ভক্তি বিনয় স্বামী মহারাজ
শ্রীমৎ ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ
শ্রীমৎ ভক্তিময় নিতাই স্বামী মহারাজ
শ্রী নাড়ু গোপাল দাস
শ্রী হংস কৃষ্ণ দাস

সমন্বয়কবৃন্দ:

শ্রী জগৎগুরু গৌরাঙ্গ দাস
শ্রী শুভ নিতাই দাস
শ্রী দ্বিজমনি গৌরাঙ্গ দাস

শুভেচ্ছা বাণী

ইস্কন প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'জাগ্রত ছাত্র সমাজ' - এর পরিচালনায় ইস্কন বাংলাদেশ স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করেছে দেশব্যাপী সর্ববৃহৎ পারমার্থিক প্রতিযোগিতা **'ভক্তিবেদান্ত মেগা কনটেস্ট-২০২৬'**। ছাত্র-ছাত্রীদের বৈচিত্র্যময় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চেতনাও বিকশিত হবে। পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিনিধিসহ সবাইকে এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী
জিবিসি-ইস্কন ও নির্দেশক -জাগ্রত ছাত্র সমাজ।

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি

- প্রথমে উপজেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
- উপজেলা থেকে জেলা তারপর বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্ব শেষে জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।
- প্রত্যেকের জন্য কুইজ বাধ্যতামূলক। কুইজ ছাড়াও সর্বোচ্চ ৩টি বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত (ইয়েস কার্ড প্রাপ্ত) প্রতিযোগীরা বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত প্রতিযোগীরা জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- সকল প্রতিযোগীদের অবশ্যই স্ব-স্ব স্কুল ড্রেস পরিধান করে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
- আগ্রহী প্রতিযোগীদের নিকটস্থ ইস্‌কন মন্দির, প্রচার কেন্দ্র ও নামহট্টে যোগাযোগ করে রেজিস্ট্রেশনপূর্বক প্রতিযোগিতার সিলেবাস ও কুইজ বই সংগ্রহ করতে হবে।
- অনলাইনে (গুগল ফরম) ও ওয়েবসাইট www.jcsdhaka.com - এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।
- রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রতিযোগীগণ স্ব স্ব স্থানীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- গুগল ফরম লিংকটি জাগ্রত ছাত্র সমাজের Facebook Page অথবা QR কোড এ পাওয়া যাবে।
- সর্বদা বিচারকদের/কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

প্রত্যেক পর্বেই থাকবে উপহার সামগ্রী, ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ইত্যাদি।

চূড়ান্ত পর্বে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীর জন্য থাকবে শিক্ষাবৃত্তি।

প্রতি গ্রুপে সেরা ১০ জন প্রতিযোগী পাবে বিশেষ পুরস্কার।

গীতার শ্লোক আবৃত্তি, ভজন-কীর্তন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রতিযোগীরা WhatsApp, Facebook, YouTube এর মাধ্যমে অডিও, ভিডিও এবং লিংক সংগ্রহ করে প্রস্তুতি নিতে পারবে।

রেজিস্ট্রেশন ফি ৳১০০

প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ

গীতার শ্লোক আবৃত্তি

উপস্থাপনের নিয়মঃ

শুরুতে **'হরেকৃষ্ণ'** সম্বোধনপূর্বক **'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'** বলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা.......অধ্যায়.......শ্লোক সংখ্যা উল্লেখপূর্বক মুখস্থ শ্লোকটি উচ্চারণ করে অনুবাদ বলতে হবে।

গ বিভাগ-২০টি শ্লোক ২/৬, ২/৭০, ৩/২১, ৪/৬, ৪/৩৬, ৫/১০, ৬/৩৫, ৭/২৫, ৮/১০, ৮/২৮, ৯/১১, ১০/৯, ১১/১৭, ১১/১৯, ১১/৩৮, ১২/২০, ১৪/১৮, ১৫/৭, ১৬/২৪, ১৮/৭৮

উপজেলা পর্যায়	৫টি শ্লোক
জেলা পর্যায়	৭টি শ্লোক
বিভাগীয় পর্যায়	১০টি শ্লোক
চূড়ান্ত পর্যায়	১৫টি শ্লোক

অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচিত শ্লোকগুলোর মধ্যে অনুষ্টুপ (২ লাইন) ও ত্রিষ্টুপ (৪ লাইন) ছন্দে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আবৃত্তি করতে হবে।

নির্বাচিত গীতার শ্লোকসমূহঃ

ন চৈতদ্ বিদ্ম কতরন্নো গরীয়ো
যদ্ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্
তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ।। ২/ ৬ ।।

অনুবাদঃ তাদের জয় করা শ্রেয়, না তাদের দ্বারা পরাজিত হওয়া শ্রেয়, তা আমরা জানি না। আমরা যদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হত্যা করি, তা হলে আমাদের আর বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়বে। তবুও এই রণাঙ্গনে এখন তারা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ।। ২/৭০ ।।

অনুবাদঃ জলরাশি সদা পরিপূর্ণ ও স্থির সমুদ্রে প্রবেশ করেও যেমন তাকে ক্ষোভিত করতে পারে না, কামসমূহও তেমন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হয়েও তাঁকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না। অতএব তিনিই শান্তিলাভ করেন, বিষয়কামী ব্যক্তি কখনও শান্তিলাভ করতে পারে না।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ।। ৩/২১ ।।

অনুবাদঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরা তার অনুসরণ করে। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, সমগ্র পৃথিবী তারই অনুগমন করে।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ।। ৪/৬ ।।

অনুবাদঃ যদিও আমি জন্মরহিত, আমার চিন্ময় দেহ অব্যয় এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ।। ৪/৩৬ ।।

অনুবাদঃ তুমি যদি সমস্ত পাপীদের থেকেও পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাক, তা হলেও এই জ্ঞানরূপ তরণীতে আরোহণ করে তুমি দুঃখের সমুদ্র পার হতে পারবে।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ।। ৫/১০ ।।

অনুবাদঃ যিনি সমস্ত কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করে অনাসক্তভাবে কর্ম করেন, কোন পাপ তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারে না, ঠিক যেমন জল পদ্মপত্রকে স্পর্শ করতে পারে না।

শ্রীভগবান উবাচ্
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।। ৬/৩৫।।

অনুবাদঃ পরমেশ্বর ভগবান বললেন – হে মহাবাহো, মন যে দুর্দমনীয় ও চঞ্চল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কৌন্তেয়, ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ।। ৭/২৫ ।।

অনুবাদঃ আমি মূঢ় ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি। তাই তারা আমার অজ ও অব্যয় স্বরূপকে জানতে পারে না।

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ।। ৮/১০ ।।

অনুবাদঃ যিনি মৃত্যুর সময় অচঞ্চলচিত্তে, ভক্তি সহকারে, পূর্ণ যোগশক্তির বলে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্ব
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ।।৮/২৮।।

অনুবাদঃ ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে তুমি কোন ফলেই বঞ্চিত হবে না। বেদপাঠ, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তপস্যা, দান আদি যত প্রকার জ্ঞান ও কর্মের সাধন আছে, সেই সমুদয়ের ফল যোগী বা ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করে আদি পরম ধাম প্রাপ্ত হন।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ।। ৯/১১ ।।

অনুবাদঃ আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।

মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।। ১০/৯।।

অনুবাদঃ যাঁদের চিত্ত ও প্রাণ সম্পূর্ণরূপে আমাতে সমর্পিত, তাঁরা আমার কথা সর্বদাই আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে ভাবের বিনিময় করে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দলাভ করেন।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।। ১১/১৭।।

অনুবাদঃ কিরীটশোভিত, গদা এবং চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান, তেজঃপুঞ্জ সমন্বিত, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রজ্বলিত অগ্নি ও সূর্যের মতো প্রভাবিশিষ্ট এবং অপ্রমেয়স্বরূপ তোমাকে আমি সর্বত্রই দেখছি।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ।। ১১/১৯ ।।

অনুবাদঃ তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নেই। তুমি অনন্ত বীর্যশালী ও অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট এবং চন্দ্র ও সূর্য তোমার নেত্রদ্বয়। তোমার মুখ থেকে প্রজ্বলিত অগ্নি নির্গত হচ্ছে এবং তুমি স্বীয় তেজ দ্বারা সমস্ত জগৎকে সন্তপ্ত করছ।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ।। ১১/৩৮ ।।

অনুবাদঃ তুমি আদিদেব, পুরাণ পুরুষ এবং এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি সব কিছুর জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয় এবং তুমিই গুণাতীত পরম ধামস্বরূপ। হে অনন্তরূপ, সমগ্র জগৎ তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ।। ১২/২০ ।।

অনুবাদঃ যাঁরা আমার দ্বারা কথিত এই ভক্তিযোগরূপ ধর্মামৃতের উপাসনা করেন, সেই সকল শ্রদ্ধাবান মৎপরায়ণ ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়।

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ।। ১৪/১৮।।

অনুবাদঃ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উর্ধ্বে উচ্চতর লোকসমূহে গমন করে, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মধ্যে নরলোকে অবস্থান করে এবং জঘন্য গুণসম্পন্ন তামসিক ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হয়ে নরকে গমন করে।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ।। ১৫/৭ ।।

অনুবাদঃ এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্নাংশ। জড় প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।। ১৬/২৪।।

অনুবাদঃ অতএব কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। শাস্ত্রীয় বিধানে কথিত কর্ম সম্বন্ধে জেনে তুমি সেই কর্ম সম্পাদন করতে যোগ্য হও।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ।। ১৮/৭৮ ।।

অনুবাদঃ যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই নিশ্চিতভাবে ঐশ্বর্য, বিজয়, অসাধারণ শক্তি ও নীতি বর্তমান থাকে। সেটিই আমার অভিমত।

ভজন-কীর্তন

প্রতিযোগীদের নামহট্ট পরিচয় ও ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন গ্রন্থ থেকে ভজন-কীর্তনের প্রস্তুতি নিতে হবে

উপজেলা পর্যায়	৪টি
জেলা পর্যায়	৬টি
বিভাগীয় পর্যায়	৮টি
চূড়ান্ত পর্যায়	১০টি

চিত্রাঙ্কন

বিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ, রাধা-কৃষ্ণ, গৌর-নিতাই, জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা দেবীর মুখমণ্ডলের পূর্ণ ছবি/ বিভিন্ন লীলার ছবি।

- সরবরাহকৃত কাগজে ছবি এঁকে রং করতে হবে।
- প্রতিযোগীদের বোর্ড নিয়ে আসতে হবে।
- রংতুলিসহ রং করার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে আসতে হবে।

বক্তৃতা

- শরণাগতি-ভক্তির মূল ভিত্তি।
- কর্মফল ও পুনর্জন্মের বিজ্ঞান।
- ধর্ম কি কুসংস্কার নাকি জীবনের বিজ্ঞান ?
- মানসিক চাপ, সিদ্ধান্তহীনতা ও গীতার সমাধান।
- ভক্তি ও শৃঙ্খলা-ছাত্র জীবনের সফলতার চাবিকাঠি।

উপস্থাপনের নিয়মঃ

- শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীদের “হরেকৃষ্ণ” সম্বোধনপূর্বক তার নিজের নাম ও বক্তৃতার বিষয় উল্লেখ করে শুরু করতে হবে। বক্তৃতার তথ্য, তত্ত্ব, উপমা, উদ্ধৃতি, উদাহরণসমূহ প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- প্রতিযোগীকে সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণ ও আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করতে হবে।
- প্রতিযোগীদের যেকোনো মত, পথ, গোষ্টি বা ব্যক্তি সমন্ধে বিরুপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে হবে।
- প্রতিযোগীদের অবশ্যই নির্দিষ্ট সময় ৪ মিনিটের মধ্যে বক্তৃতা সম্পন্ন করতে হবে।
- উপজেলা পর্যায়ে কমপক্ষে ৩টি বিষয়ের উপর প্রস্তুতি নিতে হবে।

কুইজ

- বিভাগভিত্তিক নির্ধারিত বইয়ের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রস্তুতি নিতে হবে।
- বিষয়সমূহঃ মন্ত্র ও শ্লোকাবলি, প্রশ্নোত্তর, সদাচার, প্রবন্ধ ইত্যাদি।
- উপজেলা পর্যায়ে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক (MCQ) পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে।
- পরবর্তী পর্যায়ে নৈর্ব্যক্তিক (MCQ) ও রচনামূলক পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে।
- পরীক্ষা মোট ১০০ নম্বরে হবে।
- উপজেলা পর্যায়ে ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটা যাবে না।
- জেলা পর্যায়ে প্রতি ৫টি ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে।
- বিভাগীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতি ৪টি ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে।

কুইজ

বৈদিক মন্ত্র ও শ্লোকাবলী

গুরু প্রণাম মন্ত্র:
ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র:
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ।।

নিদ্রা জাগরণের পর প্রণাম মন্ত্র:
প্রাতঃ প্রবোধিতো বিষ্ণো হৃষীকেশেন যৎ ত্বয়া।
যদযৎ কারয়শীসান তৎ করোমি তবাজ্ঞায়া ।।

জল শুদ্ধি মন্ত্র:
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী ।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।

সূর্য প্রণাম মন্ত্র:
ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধান্তারীং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ।।

চরণামৃত গ্রহণের মন্ত্র:
অকালমৃত্যু হরণং সর্বব্যাধি বিনাশনং।
বিষ্ণোপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম।।

শুচিতার মন্ত্র:
ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।।

পাঠ শুরু করার পূর্বে:
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

জন্ম–সংবাদে:
ওঁ আয়ুষ্মান ভব (ছেলের ক্ষেত্রে)
ওঁ আয়ুষ্মতী ভবঃ (মেয়ের ক্ষেত্রে)

মৃত্যু–সংবাদে:
ওঁ দিব্যান লোকান্ স গচ্ছতু
(স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে– সা গচ্ছতু)

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্
একো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা।। (গীতা মাহাত্ম্য, ৭)

অনুবাদঃ শ্রীমদ্ভগবদগীতা মাতা দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গীত হয়েছে, আর শ্রীকৃষ্ণই এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর দিব্যনামই সমস্ত মন্ত্রের সারস্বরূপ পরম মন্ত্র এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত সেবাই ভগবৎ সেবা বা জীবের একমাত্র কর্ম।

তাৎপর্যঃ এই গীতা মাহাত্ম্যে একনিষ্ঠ ভক্তির মহিমা প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে— একমাত্র শাস্ত্র হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত গীতা, আর একমাত্র উপাস্য দেব হলেন দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর পবিত্র নামসমূহই জীবনের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, যা কলিযুগে আত্মাকে শুদ্ধ ও শান্ত করে। মানবজীবনের প্রকৃত কর্ম হলো ভগবানের প্রেমময় সেবা করা, কারণ সেই সেবাই জীবনের পরম সিদ্ধি। এই শ্লোক আমাদের শেখায় যে বহু বিভ্রান্তির মাঝে একনিষ্ঠভাবে কৃষ্ণভক্তিই জীবনের আসল পথ। গীতা, কৃষ্ণনাম ও ভগবৎসেবা— এই তিনের মধ্যেই জীবনের পূর্ণতা ও চিরশান্তি নিহিত আছে।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ।। (গীতা ৫/৭)

অনুবাদঃ নিষ্কাম কর্মযোগে যুক্ত, বিশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন, আত্মসংযত ও জিতেন্দ্রিয় আত্মা সকলের প্রিয় এবং অন্য সকলেও তাঁর প্রিয়। তিনি সব সময় কর্ম করেও তাতে লিপ্ত হন না।

তাৎপর্যঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে আদর্শ যোগীর লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। যিনি ভক্তিযোগে যুক্ত হয়ে অন্তরকে শুদ্ধ করেছেন এবং মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করেছেন, তিনি সকল জীবের মধ্যে পরমাত্মার উপস্থিতি অনুভব করেন। এমন ব্যক্তি সংসারে নানা কর্ম করলেও কর্মফলে আবদ্ধ হন না, কারণ তাঁর সব কাজ ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এই শ্লোক আমাদের শেখায় যে প্রকৃত শান্তি আসে আত্মশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ ও ভগবৎ চেতনায় স্থিত থাকার মাধ্যমে। যিনি কৃষ্ণভাবনায় জীবন পরিচালনা করেন, তাঁর কর্ম তখন বন্ধনের কারণ হয় না; বরং তা হয়ে ওঠে মুক্তির পথ।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ –(ভাগবত ১১/৫/৩২

অনুবাদঃ কলিযুগে যাঁরা সু–বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁরা সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করেন যিনি সর্বদা "কৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করেন। যদিও তাঁর দেহবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ নয়, তবুও তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ। তিনি তাঁর পার্ষদ, অঙ্গ, উপাঙ্গ ও দিব্য শক্তিসহ আবির্ভূত হন এবং সংকীর্তনযজ্ঞের মাধ্যমে পূজিত হন।

তাৎপর্যঃ এখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তিনি সর্বদা কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন এবং বাহ্যিকভাবে কৃষ্ণবর্ণ না হলেও তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়ে এই যুগে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। কলিযুগের মানুষের জন্য যজ্ঞ, তপস্যা বা কঠিন সাধনার পরিবর্তে হরিনাম সংকীর্তনকেই সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায় বলা হয়েছে। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে সু–মেধাসম্পন্ন, তাঁরা এই সংকীর্তন আন্দোলনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে ভক্তিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া ।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ।। (কঠ উপনিষদ ১/৩/১৪)

অনুবাদ: হে জীবগণ, এই জড় জগতে তোমরা ঘুমিয়ে আছ! অনুগ্রহ করে জাগ এবং এই মনুষ্য–জন্মের সুযোগ গ্রহণ কর! পারমার্থিক উপলব্ধির পথ বড়ই দুর্গম। তা ক্ষুরের অগ্রভাগের মতোই ধারালো। এই হচ্ছে তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতদের অভিমত।

তাৎপর্য: "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" –এই উপনিষদীয় আহ্বান মানবজীবনের আধ্যাত্মিক জাগরণের ডাক। এখানে বলা হয়েছে, ঘুমন্ত চেতনা থেকে জেগে উঠে মহাজ্ঞানীদের শরণ গ্রহণ করে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে হবে। "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে আত্মউপলব্ধির পথ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কঠিন, যেন ক্ষুরের ধারালো প্রান্তে চলার মতো। সংসারের মোহ, কামনা ও ভোগবৃত্তি মানুষকে বারবার সেই পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়। তাই শাস্ত্র, গুরু ও ভগবানের আশ্রয়ে থেকে সতর্কতার সঙ্গে জীবন পরিচালনা করাই প্রকৃত সাধনার পথ।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা
পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংষঃ
সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ –(ঋগবেদ ১/২২/২০)

অনুবাদ: আকাশে প্রসারিত সূর্যরশ্মি যেমন জড় চক্ষুর দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনই বিজ্ঞ ভক্তগণ বিষ্ণুর সেই পরম ধামকেও সর্বদা দর্শন করেন। সেই বিশেষভাবে প্রশংসনীয় ও পরমার্থে জাগ্রত সেই বিপ্রগণ বিষ্ণুর ধামকে দর্শন করতে সক্ষম, তাই সেই পরম ধামকে প্রকাশ করতেও তারা সক্ষম।

তাৎপর্য: "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" — এই মন্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয় যে, জাগতিক চক্ষু দিয়ে নয়, ভক্তির দৃষ্টিতেই ভগবানের পরম ধাম উপলব্ধি করা যায়। সূর্য যেমন সর্বত্র আলো ছড়িয়ে দেয়, তেমনি ভগবান বিষ্ণুর কৃপাও সর্বজীবের উপর সমভাবে প্রসারিত। কিন্তু যাঁদের হৃদয় ভক্তি ও শুদ্ধতায় জাগ্রত, তাঁরাই সেই পরম সত্যকে সর্বদা দর্শন করতে সক্ষম হন। বিপ্রগণ সর্বদা ভগবানের চরণে মন নিবিষ্ট রেখে দিব্যচক্ষুর মাধ্যমে তাঁর মহিমা অনুভব করেন।

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা
জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
–(বৃঃ আরণ্যক উপনিষদ ১/৩/২৮)

অনুবাদ: অসত্যে থেকোনা, নিত্য সত্যের জগতে গমন কর। অন্ধকারে থেকোনা, জ্যোতির্ময় লোকে গমন কর। জড় দেহ গ্রহণ করে জন্ম–মৃত্যুর চক্রে ঘুরে মর না, অমরত্ব লাভ কর।

তাৎপর্য: উপনিষদের এই প্রার্থনায় মানবজীবনের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে যেন তিনি আমাদের অসত্য থেকে সত্যের পথে পরিচালিত করেন। অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের ও আত্মিক আলোর পথে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান করা হয়েছে। এছাড়া জন্ম–মৃত্যুর দুঃখময় সংসার থেকে মুক্ত হয়ে অমৃতময় চিরশান্তির পথে পৌঁছানোর প্রার্থনা করা হয়েছে। এই শ্লোক মানুষকে সত্য, জ্ঞান ও আত্মউন্নতির পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্ ।। (ঈশোপনিষদ)

অনুবাদঃ এই জগতের স্থাবর ও জঙ্গম সব কিছুরই নিয়ন্তা ও মালিক হলেন ভগবান। তাই জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক সম্পদ, যা ভগবান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, শুধু তাই গ্রহণ করতে হবে। অন্যের সম্পদে লোভ করা উচিত নয়।

তাৎপর্যঃ উপনিষদের এই মহান বাণীতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র জগৎ ভগবানের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত। জগতের সবকিছুই ভগবানের সম্পত্তি, তাই মানুষকে ভোগের মনোভাব ত্যাগ করে পরিমিতভাবে জীবনযাপন করতে হবে। এই শ্লোক আমাদের শেখায় যে, লোভ ও স্বার্থপরতা মানুষকে সত্যিকারের শান্তি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ভগবানের প্রতি সমর্পণ ও সন্তুষ্টির ভাব ধারণ করলে জীবন সুন্দর ও শান্তিময় হয়। এই শিক্ষা আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনা, বিনম্রতা ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে।

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ সামান্যমেতদ্ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মোঃ হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥
–(হিতোপদেশ)

অনুবাদঃ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন– এই চারটি কর্ম মানুষ ও পশুর মধ্যে সমানভাবে বর্তমান। কিন্তু মানুষের অধিকতর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা পারমার্থিক অনুশীলনে নিযুক্ত হতে সক্ষম। অতএব পারমার্থিক জীবন তথা ধর্ম ছাড়া মানুষ পশুরই সমান।

তাৎপর্যঃ এই চারটি প্রবৃত্তি মানুষ ও পশুর মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান। কিন্তু মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে তার ধর্মবোধ, নৈতিকতা ও আত্মিক চেতনা। ধর্ম মানুষকে সত্য, দয়া, সংযম ও ভগবৎ চিন্তার পথে পরিচালিত করে। তাই মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা হলো ধর্মাচরণের মাধ্যমে আত্মাকে উন্নত করা এবং ভগবানের সেবায় জীবনকে নিয়োজিত করা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

অনুবাদঃ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের এই ষোলটি নাম বিশেষত কলিযুগের পাপ নাশের জন্যই উদ্দিষ্ট। নিজেকে কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত রাখতে হলে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যুগধর্ম হিসেবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মতো অন্য কোনো মহান পন্থা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে অনুসন্ধান করেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাৎপর্যঃ "ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্, নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে"— এই শ্লোকে হরিনামের সর্বোচ্চ মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, কলিযুগের সমস্ত পাপ ও কলুষতা দূর করার জন্য এই ষোলো নামের মহামন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রে এর চেয়ে উত্তম কোনো সাধনপদ্ধতি উল্লেখ করা হয়নি। হরিনাম জপের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় শুদ্ধ হয় এবং ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয়। তাই কলিযুগে মুক্তি ও শান্তি লাভের জন্য হরিনাম সংকীর্তনই সর্বাধিক সহজ ও কল্যাণময় পথ।

কুইজ

বৈদিক সাধারণ জ্ঞান

০১। প্রশ্ন: ভক্তির সংজ্ঞা কী?
উত্তর: "হৃষিকেন হৃষিকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে"। আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ভগবানের সেবা করাকেই ভক্তি বলা হয়।

০২। প্রশ্ন: ভগবানের জড়া প্রকৃতি বা অপরা প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলো কী কী?
উত্তর: জড়া প্রকৃতি আটটি বিভিন্ন উপাদান হচ্ছে–

ক) ভূমি	খ) জল	গ) বায়ু	ঘ) অগ্নি
ঙ) আকাশ	চ) মন	ছ) বুদ্ধি	জ) অহংকার।

০৩। প্রশ্ন: মহাজন কারা?
উত্তর: স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা), নারদ (ব্রহ্মার মানস পুত্র), শম্ভু (শিব), কুমার (ব্রহ্মার চার পুত্র সনক, সনাতন, সনৎকুমার ও সনন্দ), কপিল (দেবহুতির পুত্র), মনু (মানবজাতির পিতা), প্রহ্লাদ (হিরণ্যকশিপুর পুত্র), জনক (সীতার পিতা), ভীষ্মদেব (গঙ্গাদেবীর পুত্র), বলি মহারাজ, বৈয়াসকি (ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী) এবং যমরাজ এই দ্বাদশ জনকে মহাজন বলা হয়।

০৪। প্রশ্ন: ত্রিতাপ ক্লেশ কী?
উত্তর: জড় জগতে অবস্থানকালে জীবাত্মা যে তিন রকম অবশ্যম্ভাবী দুঃখ লাভ করে তাকে ত্রিতাপ ক্লেশ বলে। সেগুলি হচ্ছে–
(i) আধ্যাত্মিক ক্লেশ: জীব তার নিজের মন ও শরীর থেকে যে ক্লেশ প্রাপ্ত হয় তা আধ্যাত্মিক ক্লেশ। যেমন: মানসিক কষ্ট এবং রোগ ব্যাধি ইত্যাদি।
(ii) আধিভৌতিক ক্লেশ: অন্য জীব থেকে প্রাপ্ত ক্লেশকে আধিভৌতিক ক্লেশ বলা হয়। যেমন: সাপের কামড়, মশা–মাছি, চোর–গুন্ডার উপদ্রব ইত্যাদি।
(iii) আধিদৈবিক ক্লেশ: দৈবক্রমে অর্থাৎ দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত যে ক্লেশ, তাকে আধিদৈবিক ক্লেশ বলা হয়। যেমন অনাবৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প।

০৫। প্রশ্ন: জীবের চরম লক্ষ্য কী?
উত্তর: জীবের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার হারানো সম্পর্ককে পুনঃস্থাপন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হওয়া অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা।

০৬। প্রশ্ন: আত্মা কিভাবে প্রসন্নতা লাভ করতে পারে?
উত্তর: যখন জীব তার নিত্য, শাশ্বত, ভালোবাসার বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সেই লুপ্ত সম্পর্ককে আবার পুনঃস্থাপন করে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পারে তখন সে প্রসন্নতা লাভ করে।

০৭। প্রশ্ন: কে কোন প্রকার ভক্তি অবলম্বন করে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন?
উত্তর: শ্রবণে পরীক্ষিৎ মহারাজ, কীর্তনে শুকদেব গোস্বামী, স্মরণে প্রহ্লাদ মহারাজ, পাদসেবনে লক্ষ্মী, বন্দনে অক্রুর, অর্চনে পৃথু মহারাজ, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন, এবং আত্মনিবেদনে

বলি মহারাজ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

০৮। **প্রশ্ন: ভগবানের নিরাকার, নির্বিশেষ বিভাগ কাকে বলে?**
উত্তর: ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল গোলোক বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। তাঁর দেহ থেকে নির্গত ব্রহ্মজ্যোতি সমস্ত পরব্যোমে অর্থাৎ চিদাকাশে স্থিত চিন্ময় জগৎকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। সেই জ্যোতিকে বলা হয় নির্বিশেষ বিভাগ।

০৯। **প্রশ্ন: ভক্তিযোগী কাকে বলে?**
উত্তর: ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই যাঁর একমাত্র অভিলাষ, যিনি অনন্যচিত্তে প্রগাঢ় প্রেমের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবায় যুক্ত থাকেন, তিনিই ভক্তিযোগী।

১০। **প্রশ্ন: পরম ব্রহ্ম সাকার না নিরাকার?**
উত্তর: পরম ব্রহ্ম সাকার এবং নিরাকার উভয়ই। পরম ব্রহ্মের আসল স্বরূপ সাকার রূপে তিনি গোলোক বৃন্দাবনে অবস্থান করেন এবং তাঁর শরীর হতে নির্গত জ্যোতি – যা চিন্ময় জগৎকে উদ্ভাসিত করে বিদ্যমান তাঁকে তাঁর নিরাকার রূপ বলা হয়।

১১। **প্রশ্ন: চিন্ময় জগতের সবকিছু ভগবানের কোন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়?**
উত্তর: চিন্ময় জগতের সবকিছু ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়।

১২। **প্রশ্ন: ভগবানের মায়াশক্তিকে কত ভাগে বিভক্ত করা যায়? সেগুলি কী এবং কোথায় কাজ করে?**
উত্তর: ভগবানের মায়াশক্তি দুই প্রকার: ক) যোগমায়া, খ) মহামায়া।
অন্তরঙ্গা যোগমায়া শক্তির দ্বারা চিন্ময় জগৎ পরিচালিত হয়। বহিরঙ্গা মহামায়া শক্তির দ্বারা জড় জগৎ পরিচালিত হয়।

১৩। **প্রশ্ন: যথার্থ জ্ঞান কাকে বলে?**
উত্তর: আমি এই 'শরীর' নই, আমি চিন্ময় 'আত্মা'– ভগবানের নিত্য অংশ। এইটি জানাকে বলা হয় যথার্থ জ্ঞান।

১৪। **প্রশ্ন: ১৮ অধ্যায় সমন্বিত ভগবদ্গীতাকে মুখ্যতঃ কয়ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে? সেগুলি কী কী?**
উত্তর: ১৮ অধ্যায় ভগবদ্গীতাকে মুখ্যত: তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।
প্রথম ৬টি অধ্যায়কে (১ম–৬ষ্ঠ) বলা হয় কর্মষট্ক,
মাঝের ৬টি অধ্যায়কে (৭ম–১২শ) বলা হয় ভক্তিষট্ক
শেষ ৬টি অধ্যায়কে (১৩শ–১৮শ) বলা হয় জ্ঞানষট্ক।

১৫। **প্রশ্ন: যুদ্ধক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের দর্শন করে অর্জুনের কী অবস্থা হয়েছিল?**
উত্তর: যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের দর্শন করে অর্জুনের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ অবশ হয়েছিল, মুখ শুষ্ক হয়েছিল, শরীর কম্পিত হচ্ছিল। হাত থেকে গাণ্ডীব পড়ে গিয়েছিল এবং চোখ জ্বালা করছিল।

১৬। **প্রশ্ন: গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রথম শিক্ষা কী ছিল?**
উত্তর: ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন–"অর্জুন তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছ– অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, সে বিষয়ে শোক করছ। যাঁরা যথার্থ পণ্ডিত তাঁরা কখনোই জীবিত বা মৃত কারো জন্যই শোক করেন না।"

১৭। প্রশ্ন: আত্মার বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর: আত্মার কখনো জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না, আত্মার পুনঃপুনঃ উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। আত্মা জন্মরহিত নিত্য এবং নবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মার কখনো বিনাশ হয় না। (আত্মার কখনও জন্ম হয় না তাই অজ। মৃত্যু হয় না তাই নিত্য। পুনঃপুনঃ উৎপত্তি হয় না তাই শাশ্বত)। আত্মা অচ্ছেদ্য অর্থাৎ অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না। আত্মা অদাহ্য অর্থাৎ আগুনে তাকে পোড়ানো যায় না। আত্মা অক্লেদ্য অর্থাৎ জলে ভেজানো যায় না। আত্মা অশোষ্য অর্থাৎ আত্মাকে শুকানো যায় না।

১৮। প্রশ্ন: বুদ্ধিযোগ কাকে বলে?

উত্তর: জীব যখন নিজের ইন্দ্রিয়ের সুখ–দুঃখ, তৃপ্তি–অতৃপ্তির কথা বিবেচনা না করে ভগবানের সেবায় নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করে, যখন তার সমস্ত কর্তব্যকর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় ভগবানের তৃপ্তিসাধন করা, তখন তার সেই কর্তব্যকর্ম ভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়। তাই সেই সকল কাজকর্মের ভালো অথবা মন্দ কোনোরকম ফলেরই কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সেইসব কর্তব্যকর্ম তখন হয়ে ওঠে অপ্রাকৃত কর্ম, এরই নাম বুদ্ধিযোগ।

১৯। প্রশ্ন: তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় কী?

উত্তর: তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হলে তাকে একজন তত্ত্বদ্রষ্টা সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হতে হবে এবং এই প্রকার তত্ত্বদ্রষ্টা গুরুদেবকে বিনম্রচিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং অকৃত্রিম সেবায় তাঁকে সন্তুষ্ট করে–তাঁর কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয়।

২০। প্রশ্ন: শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির কী গতি হয়?

উত্তর: শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরাশান্তি প্রাপ্ত হন।

২১। প্রশ্ন: শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কী গতি হয়?

উত্তর: শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি সংশয়হেতু ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে না পেরে বিনষ্ট হন। এই প্রকার সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি ইহলোক বা পরলোক কোথাও সুখলাভ করতে পারে না।

২২। প্রশ্ন: ভগবদ্গীতায় বর্ণিত শান্তির সূত্রটি কী?

উত্তর: ভগবদ্গীতায় বর্ণিত শান্তির সূত্রের প্রথমাংশ হলো–ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত লোকের মহেশ্বর এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। এই তিনটি বিষয় জানতে পারলে জড় জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভ করে মনুষ্য যথার্থ শান্তিপ্রাপ্ত হতে পারবে।

২৩। প্রশ্ন: মন কখন বন্ধু এবং কখন শত্রুরূপে কাজ করে?

উত্তর: যে তার মনকে জয় করে নিজের বশীভূত করে রেখেছে তার মন তার পরম বন্ধুরূপে কাজ করে, কিন্তু যে মনকে জয় করতে না পেরে মনের বশীভূত হয়েছে, তার মন শত্রুরূপে কাজ করে।

২৪। প্রশ্ন: সমস্ত প্রকার যোগীদের মধ্যে কোন যোগী শ্রেষ্ঠ?

উত্তর: সমস্ত প্রকার যোগীদের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাসহকারে 'মদ্গত চিত্তে' অর্থাৎ কৃষ্ণগতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণতেই আসক্ত হয়ে অন্তরে সবসময় তাঁর কথা চিন্তা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী। তিনি সব থেকে অন্তরঙ্গভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন।

২৫। প্রশ্ন: আমরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি কেন?

উত্তর: হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে "কলিকল্মষনাশনম্", "চেতোদর্পণ-মার্জনম্" অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই একমাত্র কলির সমস্ত কলুষ নাশ করতে পারে এবং চিত্তরূপ দর্পণকে পরিষ্কার করে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করতে পারে। এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ জড়বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার একমাত্র পথ।

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।'

এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নামই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। এছাড়া আর কোনো গতি নেই, আর কোনো গতি নেই, আর কোন গতি নেই।

২৬। প্রশ্ন: ISKCON-এ G.B.C কথার অর্থ কী?

উত্তর: GOVERNING BODY COMMISSION অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরিচালকমণ্ডলী। এই পরিচালকমণ্ডলী শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিনিধি রূপে সমস্ত বিশ্বে ISKCON-এর রক্ষণাবেক্ষণ, আচার-প্রচার ও শাস্ত্র অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। G.B.C-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

২৭। প্রশ্ন: : ISKCON এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: International Society for Krishna Consciousness.

২৮। প্রশ্ন: BBT এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: Bhaktivedanta Book Trust.

২৯। প্রশ্ন: পুনর্জন্ম কী?

উত্তর: জীবাত্মা যে শরীরের মধ্যে অবস্থান করে সেই শরীর কৌমার থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্ধক্য অবস্থায় ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু দেহস্থ আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। ঠিক যেমন পুরোনো কাপড় পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরিধান করা হয়, তেমনি জীবাত্মা ব্যবহার-অযোগ্য জরাজীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে তার কর্ম এবং বাসনা অনুসারে আরেকটি নতুন শরীর গ্রহণ করে। আত্মার এই নতুন শরীর ধারণকে বলা হয় পুনর্জন্ম।

৩০। প্রশ্ন: কর্মবন্ধন কী?

উত্তর: জীব এই জগতে বিভিন্ন জড় কামনা বাসনা নিয়ে কর্ম করে থাকে। ফলে সে তার প্রতিটি কৃতকর্মের ফলভোগ করতে বাধ্য থাকে। সেই কর্ম অনুসারে তাকে বার বার জড় শরীর ধারণ করতে হয়। নতুন শরীরে সে নতুন কর্ম করে এবং ঐসব কর্মের ফল ভোগের জন্য আবার তাকে জন্ম নিতে হয়; এ রকম চলতেই থাকে। এইরূপ বদ্ধ অবস্থাকে বলা হয় কর্মবন্ধন।

৩১। প্রশ্ন: ভগবান কে?

উত্তর: ভগবান কথাটি বিশ্লেষণ করে ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনি বলেছেন যে, "সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য এই ছয়টি ঐশ্বর্য যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বর্তমান, সেই পরম পুরুষ হচ্ছেন ভগবান।" মানুষের মধ্যে অনেককে খুব ধনী, যশস্বী ও জ্ঞানী হতে দেখা যায়, কিন্তু জগতে এমন কেউ নেই যার মধ্যে উক্ত ছয়টি গুণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন। তাই তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই।

৩২। প্রশ্ন: ভক্তি কীভাবে লাভ করা যায়?
উত্তর: "ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন উপজায়তে" অর্থাৎ ভগবানের ভক্তের সঙ্গ করার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়।

৩৩। প্রশ্ন: শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কোন ভবিষ্যদ্বাণীকে প্রভুপাদ বাস্তবে রূপদান করেছেন?
উত্তর: "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"– এই ভবিষ্যদ্বাণীকে শ্রীল প্রভুপাদ বাস্তবে রূপায়িত করে সারা বিশ্বে হরিনাম প্রচার করেছেন।

৩৪। প্রশ্ন: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের কোন অধ্যায় নিয়ে গঠিত?
উত্তর: মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের ২৫ থেকে ৪২ অধ্যায় পর্যন্ত মোট ১৮ অধ্যায়ে ৭০০ শ্লোক নিয়ে গঠিত।

৩৫। প্রশ্ন: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কে কতটি শ্লোক বলেছেন?
উত্তর: ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৫৭৪টি, অর্জুন ৮৫টি, সঞ্জয় ৪০টি ও ধৃতরাষ্ট্র ১টি শ্লোক বলেছেন।

৩৬। প্রশ্ন: চার বেদের মন্ত্র সংখ্যা কত?
উত্তর: ঋগ্বেদঃ ১০,৪৭২টি, সামবেদঃ ১,৮১০টি, যজুর্বেদঃ ৪,০৯৯টি, অথর্ববেদঃ ৬,০০০টি।

৩৭। প্রশ্ন: দশ অবতারের নাম লেখ।
উত্তর: মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

৩৮। প্রশ্ন: দশবিধ সংস্কার কী কী?
উত্তর: গর্ভাধান, পুংসবন, সীমান্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহ।

৩৯। প্রশ্ন: অষ্টাঙ্গ যোগের প্রণেতা কে?
উত্তর: মহর্ষি পতঞ্জলি।

৪০। প্রশ্ন: মহর্ষি পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগ কি কি?
উত্তর: যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

৪১। প্রশ্ন: জীবের চেতনা কয় প্রকার ও কী কী?
উত্তর: পাঁচ প্রকার– ১) আচ্ছাদিত চেতনা, (২) সংকুচিত চেতনা, (৩) মুকুলিত চেতনা, (৪) বিকশিত চেতনা, (৫) পূর্ণ বিকশিত চেতনা।

৪২। প্রশ্ন: ৪ যুগের মানুষের আয়ু বর্ণনা কর।
উত্তর: সত্যযুগে মানুষের জীবনকাল ১ লক্ষ বছর, ত্রেতাযুগে দশগুণ কমে ১০ হাজার বছর, তার দশগুণ কমে দ্বাপর যুগে মানুষের আয়ু ১ হাজার বছর। কলিযুগে মানুষের গড় আয়ু ১০০ বছর।

৪৩। প্রশ্ন: চার যুগের আয়ু কত বছর?
উত্তর: সত্য যুগঃ ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বছর, ত্রেতা যুগঃ ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বছর, দ্বাপর যুগঃ ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বছর, কলি যুগঃ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বছর।

৪৪। প্রশ্ন: চতুষ্কুমার কারা?
উত্তর: সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার।

৪৫। প্রশ্ন: চার সম্প্রদায় কী কী?
উত্তর: শ্রী, রুদ্র, কুমার ও ব্রহ্ম–মাধ্ব–গৌড়ীয়।

৪৬। প্রশ্ন: চতুর্ব্যূহ কী?
উত্তর: বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

৪৭। প্রশ্ন: পঞ্চতত্ত্ব কে কে?
উত্তর: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত আচার্য প্রভু, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস ঠাকুর।

৪৮। প্রশ্ন: পঞ্চসতী কে কে?
উত্তর: অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী।

৪৯। প্রশ্ন: ষড় গোস্বামী কে কে?
উত্তর: (i) রূপ গোস্বামী, (ii) সনাতন গোস্বামী, (iii) রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, (iv) রঘুনাথ দাস গোস্বামী, (v) গোপাল ভট্ট গোস্বামী (vi) জীব গোস্বামী।

৫০। প্রশ্ন: ষড় রিপু কী কী?
উত্তর: কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য।

৫১। প্রশ্ন: সপ্তর্ষি কে কে?
উত্তর: কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ।

৫২। প্রশ্ন: সপ্ত নদী কী কী?
উত্তর: গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী ও গোদাবরী।

৫৩। প্রশ্ন: সপ্ত মাতা কে কে?
উত্তর: জন্মদাত্রী, গুরু–পত্নী, ব্রাহ্মণ–পত্নী, রাজ–পত্নী, ধাত্রী, বসুমতি (পৃথিবী), গাভী।

৫৪। প্রশ্ন: ঊর্ধ্বে সপ্ত লোক কী কী?
উত্তর: ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক।

৫৫। প্রশ্ন: নিম্নের সপ্তলোক কী কী?
উত্তর: অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল।

৫৬। প্রশ্ন: অষ্টসখী কে কে?
উত্তর: ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী।

৫৭। প্রশ্ন: গঙ্গা কবে এবং কোথা থেকে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়?
উত্তর: সত্যযুগের শুরুতে স্বর্গলোক থেকে গঙ্গা ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

৫৮। প্রশ্ন: ব্রাহ্মণের কতগুলো গুণ থাকা উচিত?
উত্তর: নয়টি গুণ। যথা:
(i) শম: অন্তর ইন্দ্রিয়ের (মন) সংযম, **(ii) দম:** বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) সংযম, **(iii) তপ:** তপস্যা, **(iv) শৌচ:** অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শুচিতা, **(v) ক্ষমা:** ক্ষমা করা, **(vi) সরলতা:** ভেতরে ও বাইরে এক, **(vii) জ্ঞান:** শাস্ত্রজ্ঞান, **(viii) বিজ্ঞান:** জ্ঞানের প্রয়োগ, **(ix) আস্তিক্য:** ধর্মপরায়ণতা।

৫৯। প্রশ্ন: এই জগতে কত প্রকার জীব প্রজাতি রয়েছে? তাদের বর্ণনা দাও।
উত্তর: এই জড় জগতে ৮৪ লক্ষ প্রকার জীব প্রজাতি রয়েছে। এদের মধ্যে কীটপতঙ্গ ১১ লক্ষ, জলচর ৯ লক্ষ, উদ্ভিদ ২০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, পাখি ১০ লক্ষ এবং মানুষের মধ্যে রয়েছে ৪ লক্ষ প্রজাতি।

৬০। প্রশ্ন: শ্রীকৃষ্ণের পিতা–মাতার নাম কী?
উত্তর: পিতা নন্দ মহারাজ এবং মাতা যশোদা দেবী।

৬১। প্রশ্ন: শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতামাতার নাম কী?
উত্তর: পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচী দেবী।

৬২। প্রশ্ন: ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পিতা–মাতার নাম কি?
উত্তর: পিতা রাজা দশরথ ও মাতা কৌশল্যা।

৬৩। প্রশ্ন: হনুমানের পিতা–মাতার নাম কি?
উত্তর: পিতার নাম কেশরী এবং মাতার নাম অঞ্জনা।

৬৪। প্রশ্ন: ২০২৬ সালে ইস্‌কনের কততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে?
উত্তর: ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে।

৬৫। প্রশ্ন: "অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া" শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শব্দের অর্থ "শেষ যজ্ঞ"।

৬৬। প্রশ্ন: "মহারথী" কাদের বলা হয়?
উত্তর: যাঁরা অস্ত্র এবং শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং যুদ্ধে একাকীই দশ হাজার ধনুর্ধারী যোদ্ধাকে পরিচালনা করতে সক্ষম, তাদের মহারথী বলা হয়।

৬৭। প্রশ্ন: অর্জুনের শঙ্খের বিশেষত্ব কি ছিল?
উত্তর: নিবাতকবচ দৈত্যদের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধের সময় অর্জুন দেবতাদের পক্ষে যুদ্ধ করে ঐ সমস্ত দৈত্যদের বধ করেছিলেন। সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনকে দেবদত্ত নামক শঙ্খটি উপহার দিয়েছিলেন। এই শঙ্খের ধ্বনি অত্যন্ত উচ্চস্বরে হতো, যার ফলে শত্রুসৈন্য ভীতচকিত হতো।

৬৮। প্রশ্ন: শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম "পাঞ্চজন্য" কেন হয়েছিল?
উত্তর: শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চজন নামক দৈত্যকে বধ করে তার শঙ্খরূপ দেহটিকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর শঙ্খের নাম হয়েছিল পাঞ্চজন্য।

৬৯। প্রশ্ন: অর্জুনের রথের নাম কি ছিল? এরূপ নাম হওয়ার কারণ কি?
উত্তর: কপিধ্বজ। অর্জুনের রথে হনুমান চিহ্নিত পতাকা শোভা পাচ্ছিল, তাই এরকম নাম হয়েছিল।

৭০। প্রশ্ন: "আর্য" কাদের বলা হয়?
উত্তর: যারা জীবনের প্রকৃত মূল্য বোঝেন এবং যাদের সভ্যতা অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কর্তব্য প্রাপ্ত হন তা নিজ কল্যাণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উৎসাহ এবং তৎপরতা সহকারে সুষ্ঠুভাবে সমাপন করেন। নিজ কর্তব্য পালনে এদের মধ্যে কোন কাপুরুষতা দেখা যায়না।

৭১। প্রশ্ন: "ধীর" কাকে বলা হয়?

উত্তর: যে ব্যক্তি দেহ, আত্মা, পরমাত্মা এবং বিনাশশীল জড় জগৎ ও শাশ্বত চিন্ময় জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত, তাঁকে বলা 'ধীর'। এই প্রকার মানুষ জড় দেহের পরিবর্তনের জন্য কখনো শোক করেন না। দেহ এবং দেহী (আত্মা) সর্বতোভাবে পৃথক এই বিষয়ে তিনি কখনোও মোহগ্রস্ত হন না।

৭২। প্রশ্ন: "অমৃতত্ত্ব" লাভের প্রকৃত অধিকারী কে?

উত্তর: এই মনুষ্য জন্ম সুখ–দুঃখ ভোগ করার জন্য সৃষ্ট নয়, বরং সুখ–দুঃখ ছাড়িয়ে মহৎ আনন্দ, পরম শান্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট। যাঁর সুখ–দুঃখে সমভাব, তিনিই অমৃতত্ত্ব (মুক্তি) লাভের প্রকৃত অধিকারী।

৭৩। প্রশ্ন: "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি" কাকে বলে?

উত্তর: কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত নিঃশঙ্কচিত্তে বিশ্বাস করেন যে ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করলে সমস্ত কর্তব্যকর্ম সম্পাদিত হয় এবং ভগবান তাঁকে এই জড় জগতের বন্ধনমুক্ত করে ভগবৎ ধামে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে যাবেন। এই বিশ্বাসকে বলা হয় ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি।

৭৪। প্রশ্ন: "নির্যোগক্ষেম" হওয়ার অর্থ কি?

উত্তর: 'যোগ' শব্দের অর্থ – অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং 'ক্ষেম' শব্দের অর্থ প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ। 'নির্যোগক্ষেম' হওয়ার অর্থ হল অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভ করার এবং তা রক্ষার চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ কোন বস্তুর প্রাপ্তি ঘটুক এবং প্রাপ্ত বস্তু রক্ষিত হতে থাকুক মনে এই ভাবও উদয় না হওয়া।

৭৫। প্রশ্ন: স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে অবস্থান করেন?

উত্তর: কূর্ম (কচ্ছপ) যেমন তার ছয়টি অঙ্গ (চারটি পা, মাথা ও লেজ) তার কঠিন খোলসের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে অবস্থান করে, তেমনি স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও মন সহ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে তাদের নিজ নিজ বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) থেকে প্রত্যাহার করে অবস্থান করেন। অর্থাৎ তিনি বিষয়গুলো নিয়ে কখনো মনে কোনো চিন্তা আসতে দেন না।

৭৬। প্রশ্ন: "সৃজামি" কথাটির তাৎপর্য কি?

উত্তর: "সৃজামি" অর্থ প্রকাশ করা, সৃষ্টি করা নয়। ভগবানের সমস্ত রূপ–ই শাশ্বত, নিত্য বিদ্যমান। সৃজামি কথাটির তাৎপর্য হল ভগবান তাঁর স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে অজ্ঞ, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের (নির্বিশেষবাদীদের) সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান করেন।

৭৭। প্রশ্ন: "বিশুদ্ধাত্মা" কাকে বলে?

উত্তর: জড় জাগতিক বস্তুগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অন্তঃকরণে সেই বস্তুগুলি পাওয়ার এবং তার থেকে সুখভোগ করার কামনা জাগ্রত হয় যার ফলে অন্তঃকরণ দূষিত হয়। যাঁর অন্তঃকরণ নিষ্কাম, তিনিই বিশুদ্ধাত্মা, তিনি জানেন কৃষ্ণই সবকিছুর মালিক এবং কৃষ্ণই ভোক্তা।

৭৮। প্রশ্ন: "অসম্মূঢ়" কাকে বলা হয়?

উত্তর: যে পরমতত্ত্ব সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান তা অনুভব না করা এবং যার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই সেই উৎপত্তি ও বিনাশশীল জগৎ সংসারকে সত্য বলে মনে করা একে মূঢ়তা বলা হয়। এই মূঢ়তা যার মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত হয়েছে, এখানে তাঁকেই "অসম্মূঢ়" বলা হয়।

৭৯। **প্রশ্ন: “ব্রহ্মনির্বাণম্” – পদটির অর্থ কি?**
উত্তর: “ব্রহ্মনির্বাণম্” পদটির অর্থ হল – যার কখনো কোন ব্যাকুলতা ছিল না, নেই বা হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়, ব্রহ্ম হলেন এরূপ নির্বাণ অর্থাৎ শান্ত। কৃষ্ণভক্ত সর্বক্ষণ কৃষ্ণভাবনায় তৎপর থাকার ফলে জগতের দুঃখ কষ্টের প্রতি সম্পূর্ণ নির্বিকার। ভগবৎ–উপলব্ধির এই স্তরকে বলা হয় ব্রহ্মনির্বাণ, অর্থাৎ ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন থাকার ফলে প্রাকৃত দুঃখ–কষ্টের পূর্ণ নিবৃত্তি।

৮০। **প্রশ্ন: যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষ্মণ কি?**
উত্তর: যোগারূঢ় ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়; প্রশান্তচিত্ত বা পরমাত্মার চিন্তায় সমাহিত; শীত–উষ্ণ, সুখ–দুঃখ, সম্মান–অপমানে সমভাব সম্পন্ন; তত্ত্বজ্ঞানে পরিতৃপ্ত; মাটি–পাথর–সোনার প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন; বন্ধু–শত্রু–ধার্মিক–পাপাচারী সকল ব্যক্তির প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন; সমস্ত রকম বাসনা ও পরিগ্রহ রহিত হবেন।

৮১। **প্রশ্ন: “জিতাত্মা” ব্যক্তি কাকে বলে?**
উত্তর: যে ব্যক্তি শরীর–ইন্দ্রিয়াদি–মন–বুদ্ধি ইত্যাদি কোন প্রাকৃত পদার্থকে নিজের বলে মনে করে না এবং ঐ প্রাকৃত পদার্থগুলির সঙ্গে কিছু মাত্র আপনভাব রাখে না তাকে বলা হয়‘ জিতাত্মা’। জিতাত্মা ব্যক্তি নিজের মঙ্গল তো করেই, তার দ্বারা জগতেরও অনেক উপকার হয়।

৮২। **প্রশ্ন: “সততং কীর্তয়ন্তো মাং”– কথাটির তাৎপর্য কি?**
উত্তর: মহাত্মারা সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনে মগ্ন থাকেন। মহিমা কীর্তনের অর্থ হলো ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ, ভগবানের ধাম এবং ভগবানের অদ্ভুত লীলা সমূহের কীর্তন করা। তিনি ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে অবগত।

৮৩। **প্রশ্ন: দেহরূপ রথে মনকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?**
উত্তর: বলগা।

৮৪। **প্রশ্ন: কিভাবে মনকে বশীভূত করা যায়?**
উত্তর: অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়।

৮৫। **প্রশ্ন: গীতার জ্ঞানকে “রাজবিদ্যা” বলা হয়েছে কেন?**
উত্তর: ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা হচ্ছে সমস্ত বিদ্যার রাজা, যার দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। এই তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে আত্মা ও দেহের পার্থক্য জানা যায় এবং এর চরম পরিণতি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। তাই এই জ্ঞানকে রাজবিদ্যা বলা হয়েছে। এই জ্ঞান যথাযথভাবে অবগত হলে আর কিছু জানার বাকী থাকেনা।

৮৬। **প্রশ্ন: ভগবানকে “তমসঃ পরস্তাৎ” বলা হয়েছে কেন?**
উত্তর: এই জড় জগৎ হল অজ্ঞানতার অন্ধকারে পরিপূর্ণ। কিন্তু ভগবান হলেন এই জড় জগতের অতীত। তিনি হলেন সমস্ত জ্ঞানের উৎস, তাঁর থেকেই সমস্ত জ্ঞান প্রকাশিত হয়। তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র অজ্ঞানতা থাকে না। তাই তাঁকে ‘তমসঃ পরস্তাৎ’ বা অন্ধকারের অতীত বলা হয়েছে।

৮৭। **প্রশ্ন: ভগবানকে “অচিন্ত্য” বলা হয়েছে। যিনি অচিন্ত্য তাঁকে মানুষ কিভাবে চিন্তা করবে, স্মরণ করবে?**
উত্তর: ভগবানকে দার্শনিক অনুমান, তর্ক, যুক্তি আদির দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রে ভগবান সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে তার অনুসরণ করা। তাহলেই সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

৮৮। প্রশ্ন: ভগবানকে "অনোরণীয়াংসম্" বলা হয়েছে কেন?

উত্তর: ভগবান এতই সূক্ষ্ম যে কেশাগ্রের দশ–হাজার ভাগের একভাগ আয়তন বিশিষ্ট জীবাত্মার অন্তরে প্রবেশ করে তাদের পরিচালিত করেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণুতে প্রবেশ করেন, তাই তাঁকে অনোরণীয়াংসম্' বা সুক্ষতম থেকেও সূক্ষ্মতর বলা হয়েছে।

৮৯। প্রশ্ন: ভগবানকে "সর্বস্যধাতারম্" বলা হয়েছে কেন?

উত্তর: ভগবান অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা। এই সমস্তই তাঁর থেকে সত্ত্বা লাভ করে। তিনি সমস্ত কিছুর ধারক ও পোষক। তাই তাঁকে 'সর্বস্যধাতারম্' বলা হয়েছে।

৯০। প্রশ্ন: ভগবানকে "অচিন্ত্যরূপম" বলা হয়েছে কেন?

উত্তর: ভগবানের শক্তি আমাদের চিন্তার অতীত। তিনি সমগ্র জড় জগতে পরিব্যাপ্ত, তবুও তিনি এই জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত। তিনি তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছেন। ভগবান এই জড় জগতের অতীত – দার্শনিক অনুমান, তর্ক, যুক্তি ইত্যাদির দ্বারা উপলব্ধ নন। তাই তাঁকে 'অচিন্ত্যরূপম্' বলা হয়েছে।

৯১। প্রশ্ন: "একভক্তিবিশিষ্যতে" বলতে ভগবান কি বুঝিয়েছেন?

উত্তর: 'একভক্তিবিশিষ্যতে' অর্থ ভক্তের আকর্ষণ একমাত্র ভগবানের প্রতিই থাকে। তাঁর নিজের কোনও ইচ্ছাই থাকে না। অর্থার্থী ভক্ত আনুকূল্য চায়, আর্ত ভক্ত প্রতিকূলতা দূর হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, জিজ্ঞাসু ভক্ত ভগবত্তত্ত্ব জানার আগ্রহ পোষণ করেন। সেজন্য তাঁদের 'একভক্তি' অর্থাৎ কেবল ভগবানে প্রেম থাকে না। কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত নিজের কোন ইচ্ছা পোষণ করেন না, তাই তিনি একক ভক্তিযুক্ত।

৯২। প্রশ্ন: "মৎপরায়ণঃ" – কথাটির অর্থ কি?

উত্তর: মৎপরায়ণঃ কথাটির অর্থ হল – "আমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে নিজের কিছু করার বা করানোর বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে যেন না হয়। আমার অভিন্ন হয়ে আমার ক্রীড়নক হয়ে যেন থাকে।"

৯৩। প্রশ্ন: মায়াকে অতিক্রম করার উপায় কি?

উত্তর: শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মায়ার অধীশ্বর। তাই তিনি যখন এই অলঙ্ঘনীয় মায়াকে আদেশ দেন কাউকে মুক্ত করে দিতে, মায়া তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই আদেশ পালন করেন।

৯৪। প্রশ্ন: "যুক্তৈবম্" কথাটির তাৎপর্য কি?

উত্তর: 'যুক্ত এবম' – কথাটির তাৎপর্য হল এই যে, মদ্ভক্ত হলে তুমি স্বয়ং আমাতে অর্পিত হবে, মন্মনা হলে তোমার চিত্ত আমাতে অর্পিত হবে, মদযাজী হলে তোমার সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থ আমাতে অর্পিত হবে এবং মাং নমস্কুরু দ্বারা তোমার দেহ আমার পদপ্রান্তে অর্পিত হবে। এইভাবে তুমি যদি নিজেকে সর্বতোভাবে আমাতে যুক্ত কর, তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হবে।

কুইজ

প্রবন্ধ

ভগবানের স্বরূপ

ভগবান তো সর্বব্যাপ্ত। তাঁর কি কোনো আকার হতে পারে?

আর তাঁর শক্তিসমূহও তো নিরাকার। তাঁকে যদি কোনো রূপ প্রদান করা হয়, তবে কি তাঁকে সীমিত করা হয় না?

তিনি তো অসীম অনন্ত। অনন্ত অসীম পরমেশ্বর ভগবান কীভাবে রূপ ধারণ করে সীমিত হতে পারেন?

যে সমস্ত রূপে তাঁর পূজা করা হয়, সেগুলো কাল্পনিক নয় কি?

আমাদের মনে এ ধরনের প্রশ্ন আসাটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, আমরা আমাদের এই জড় চোখ দ্বারা ভগবানকে দেখতে পারি না।

ভগবানের আকার থাকতে পারে কি না তা জানতে হলে প্রথমেই আমাদের ভগবান বা সৃষ্টিকর্তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে হবে।

ভগবান মানে যিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ–

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥" (ঈশোপনিষদ, আবাহন মন্ত্র)

তাঁর মধ্যে কোনো অপূর্ণতা থাকবে না। তাই যদি বলা হয় ভগবানের কোনো রূপ থাকতে পারে না। তবে তা তাঁর অপূর্ণতারই পরিচায়ক। আবার, তিনি সর্বশক্তিমান; সৃষ্টি–স্থিতি প্রলয় সবকিছুর নিয়ন্তা। যদি তাঁর কোনো রূপ না থাকে, তবে কি তাতে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা খর্ব হয় না?

আরেক দিক থেকে, আমরা সকলেই সাকার, আমাদের রূপ রয়েছে, আমাদের পিতারও রূপ রয়েছে, তার পিতারও রূপ ছিল, এটাই স্বাভাবিক। তবে যিনি সকলের আদি পিতা, সকল রূপের স্রষ্টা, তিনি কী করে রূপহীন হবেন? অবশ্যই তাঁরও রূপ রয়েছে।

আবার, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই তাঁর সৃষ্টি অপেক্ষা কম গুণসম্পন্ন হবেন না। তাই ঈশ্বর, ভগবান, সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা যাই বলি না কেন, তিনি হবেন সর্বতোভাবে পূর্ণ, তাঁর মধ্যে কোনো কমতি বা অভাব থাকবে না। ঠিক যেমন তাঁর শক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান, সৌন্দর্যের অভাব নেই, তেমনি তাঁর রূপেরও অভাব নেই। চোখ, কান, পা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়বিহীন ব্যক্তিকে বলা হয় যথাক্রমে অন্ধ, বধির, পঙ্গু। ঈশ্বর নিশ্চয়ই তেমন নন। অতএব, পূর্ণতা হেতু অবশ্যই তাঁর রূপ আছে।

ঋগ্বেদ সংহিতায় (১.১৫৫.৪) শ্রীবিষ্ণুকে জগতের সকলের স্বামী (প্রভু) ও পালনকর্তারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সূক্তের ৬নং মন্ত্রে বলা হয়েছে– বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্কভির্যুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্ ॥ অর্থাৎ, "বিষ্ণু বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট ও স্তুতি দ্বারা অপরিমেয়, তিনি নিত্য তরুণ ও আকুমার এবং তিনি যজ্ঞস্থলে গমন করেন।"

নিশ্চয়ই তিনি সর্বশক্তিমান?

তবে আজকাল কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি বলে থাকেন যে, "ভগবান সর্বশক্তিমান, কিন্তু তিনি সবকিছু করতে পারেন না।" কী হাস্যকর কথা!

যাহোক, যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, সুতরাং, তিনি একটি নির্দিষ্ট রূপে এক স্থানে বিদ্যমান থেকেও সর্বব্যাপ্ত হতে পারেন। ঠিক যেমন, সূর্য তার স্বরূপে স্বস্থানে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আলোকরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডজুড়ে ব্যাপ্ত। যদি সামান্য সূর্যের এ ক্ষমতা থাকে, তবে সর্বশক্তিমান ভগবানের কি সে ক্ষমতা নেই? তাঁর নির্দিষ্ট রূপ থাকা সত্ত্বেও তিনি কোন কার্যটি করতে অক্ষম হচ্ছেন? এর কোনো উত্তর নেই। কারণ, তিনি অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন। তাই তিনি একস্থানে থেকেও যুগপৎ সর্বত্র বিদ্যমান। যেমন, ভগবান তাঁর ধামে নিত্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদের বাক্য সত্যে পরিণত করতে এবং অসুর হিরণ্যকশিপুকে বধ করতে তিনি স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এক স্থানে থেকেও তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিদ্যমান। এমনকি ব্রহ্মরূপে তিনি প্রতিটি অণু–পরমাণুতে বিদ্যমান, সুতরাং রূপ আছে বলে যে, তিনি সসীম এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। প্রকৃত অর্থে ভগবান অসীম হয়েও সসীম হতে পারেন, আবার, তিনি সসীম রূপেও অসীম।

যদি তাঁর নিরাকার স্বরূপ না থাকে, তবে তিনি কীভাবে সর্বব্যাপ্ত?

ঈশ্বর নিরাকার, তিনি সাকার হতে পারেন না, আবার, তিনি সাকার, কিন্তু নিরাকার হতে পারেন না– এ দুটোই অপূর্ণ জ্ঞান। তাই যারা পরমতত্ত্বকে কেবল নিরাকার বলছে, তারা তাঁর আংশিক রূপের প্রতি বিশ্বাস করছে। প্রকৃতপক্ষে, পরমতত্ত্বের তিনটি প্রকাশ– ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। যেমন, একটি শিশু জানে যে, জল তরল পদার্থ, কিন্তু সে জানে না যে, জলের আরো দুটি রূপ রয়েছে– কঠিন ও বায়বীয়। তারা জলকে স্বীকার করবে, কিন্তু অন্য দুটি রূপকে স্বীকার করবে না, এটাই স্বাভাবিক। এটা তাদের দোষ নয়, অপূর্ণতা। আবার, যদি কেউ একটিকে স্বীকার করে অন্যটিকে অস্বীকার করে, তবে সেটাও অযৌক্তিক। কারণ, একই পদার্থের তিনটি রূপ।

যারা ভগবানকে কেবল নিরাকার নির্বিশেষ বলে দাবি করে, তাদের ধারণা ভুল নয়, অপূর্ণ। কারণ, তারা এটাকেই মূল স্বরূপ বলে মনে করে। যেমন, কোনো ব্যক্তি (যিনি কখনো ট্রেন দেখেননি) রাতের অন্ধকারে দূর থেকে ট্রেনের আলো দেখে মনে করতে পারে যে, ট্রেন এক প্রকার আলো। কিন্তু ব্যক্তিটি যখন প্লাটফর্মে ট্রেনটির কাছাকাছি যাবেন তিনি দেখতে পাবেন–ট্রেন হচ্ছে কতগুলো কামড়ার সমষ্টি ও সর্পিলাকার একটি বৃহৎ যানবিশেষ। আবার, যখন ভেতরে প্রবেশ করবেন বা ট্রেনে চড়বেন, তখন তার বাস্তব উপলব্ধি হবে যে, ট্রেন প্রকৃতপক্ষে কী বস্তু। একইভাবে, নির্বিশেষবাদী বা নিরাকারবাদীরা মনে করে, ভগবানের নির্বিশেষ রূপই সবকিছু। কারণ তারা কেবল সেই ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করেন। এটা ঠিক দূর থেকে ট্রেনের কেবল আলোক দর্শনের মতো। আবার, যোগীগণ হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে নিশ্চল ব্যক্তিরূপে দর্শন করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করে তাঁর প্রত্যক্ষ সেবায় যুক্ত হন এবং তাঁর পার্ষদত্ব লাভ করেন। তাই নির্বিশেষবাদীদের কাছে তিনি নিরাকার, ভগবদ্ভক্তের কাছে তিনি সাকার।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি

আমাদের আদি শাস্ত্র বেদে নাকি ঈশ্বর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– ন তস্য প্রতিমা অস্তি অর্থাৎ, তাঁর কোনো প্রতিমা নেই। তাহলে আমরা যে ভগবান বা বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিকৃতি, মূর্তি বা প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করি, সেটা কি ঠিক?

এটি বেদের শ্লোক এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও তার উল্লেখ রয়েছে; যাদের বেদ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা নেই, তারা যজুর্বেদ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দুটি শ্লোকের মাঝখানের কিছু অংশ তুলে ধরে এর কদর্থ করে বলে, পরমেশ্বরের কোনো প্রতিকৃতি নেই।

সংস্কৃত 'প্রতিমা' শব্দটি 'প্রতিম' শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন।

প্রতিম = প্রতি + মা+অ
প্রতিমা = প্রতি + মা+অ+আ

'প্রতিম' শব্দের অর্থ 'তুলনীয়' এবং 'অপ্রতিম' অর্থ 'অতুলনীয়'। 'প্রতিম' থেকেই 'প্রতিমা' শব্দটি এসেছে। তাই "ন তস্য প্রতিমা অস্তি"– শ্লোকাংশটির অর্থ দাঁড়ায়, তাঁর কোনো তুলনা নেই। আরো ভেঙে বলতে গেলে, তাঁর তুল্য কেউ নেই। তিনি অসমোর্ধ্ব। বর্তমানে বাংলায় প্রতিমা শব্দটি প্রতিকৃতি বা দেবমূর্তি অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই প্রতিকৃতি কোনো বস্তু বা ব্যক্তির সদৃশ কোনো রূপ ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হয়। ঠিক যেমন, সন্দেশ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংবাদ বা খবর। আবার, এর আরেকটি অর্থ মিঠাই বা খাবার বিশেষ। শব্দার্থবিদ্যায় এরকম বহু অর্থের প্রয়োগ দেখা যায়। সংস্কৃতে এমন শব্দের অভাব নেই। একটি

উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমনঃ
সিংহো মৃগেন্দ্রঃ পঞ্চাস্যো হর্ষক্ষ্যঃ কেশরী হরিঃ। (অমরকোষ, সিংহাদিবর্গ)
শ্রবণা মাধবো বিষ্ণুরচ্যুতঃ কেশবো হরিঃ। (নক্ষত্রাভিধান)

এখানে প্রথম বাক্যে 'হরি' শব্দে 'সিংহ' ও পরের বাক্যে 'হরি' অর্থে 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে' বোঝানো হয়েছে। এরকম অসংখ্য শ্লোক সংস্কৃতে পাওয়া যাবে। তাই বলে সিংহের স্থলে ভগবান ও ভগবানের স্থলে সিংহের প্রয়োগ করলে নিশ্চয়ই তাকে মূর্খ ছাড়া অন্য কিছু বলা হবে না।

আবার ইংরেজির ক্ষেত্রেও এরকম শব্দ পাওয়া যায়। যেমন 'Kind' শব্দটির একটি অর্থ 'দয়ালু' আরেকটি অর্থ 'প্রকার'। এরকম সব ভাষাতেই এ ধরনের বহু শব্দ রয়েছে। সংস্কৃতের তো কথাই নেই। সেক্ষেত্রে প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে আমাদের দেখতে হবে যে, কোন অর্থে সেটি ব্যবহৃত হয়েছে।

অভিধানে 'প্রতিমা' শব্দের দুই প্রকার অর্থ পাওয়া যায়। যথা–

১. প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্তি, ভাস্কর্য, বিগ্রহ ইত্যাদি এবং
২. তুলনা বা তুল্য, সাদৃশ্য, উপমা ইত্যাদি।

এই মন্ত্রে 'প্রতিমা' শব্দের 'প্রতিকৃতি বা মূতি' অর্থ গ্রহণ করলে এর অর্থ দাঁড়ায়– যাঁর নামে মহৎ যশ আছে, তাঁর মূর্তি বা বিগ্রহ নেই।

কিন্তু এ অর্থ সম্পূর্ণ অসঙ্গত, কারণ মূর্তি নির্মাণই যদি যশস্বীদের যশের হানিকর হয়, তাহলে পৃথিবীজুড়ে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের যেসকল মূর্তি নির্মিত আছে, সেগুলো তাদের দুষ্কৃতির চিহ্ন বলেই বিবেচিত হতো। অথচ আমরা দেখি জগতে হীন ব্যক্তির নয়, যশস্বী ব্যক্তিগণেরই মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ করে রাখা হয়।

দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে– যাঁর নামে মহৎ যশ আছে, তাঁর তুল্য বা সাদৃশ্য কেউ নেই।

বাজারে প্রচলিত বেদের অনুবাদগুলো যাচাই করলে দেখা যায়, দুয়েকজন তথাকথিত পণ্ডিত ব্যতীত প্রত্যেক অনুবাদকই এই মন্ত্রের ‘প্রতিমা’ শব্দের ‘তুলনা’ অর্থ করেছেন।

তুলনা হয় দুটো ভিন্ন সত্তার মধ্যে। যদি আমরা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কারো মূর্তি নির্মাণ করে বলি যে, তা ঈশ্বরের তুল্য এবং ঈশ্বর হিসেবে সেই মূর্তি পূজা করি। কিন্তু আমরা তো ঈশ্বরেরই শ্রীমূর্তির পূজা করছি। ঈশৎ কালো ঈশৎ নীল বর্ণ দেহ, পদ্মপাপড়ির মতো চোখ, স্মিতহাস্য অত্যন্ত সুন্দর মুখমণ্ডল, কুঞ্চিত কেশ, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, গলায় ফুলের মালা, পরনে হলুদ ধূতি, হাতে বাঁশি– এরকম এক ব্যক্তির বিভিন্ন ভঙ্গিমায় অঙ্কিত ছবি দেখে কে চিনতে পারবে না যে সেগুলো কৃষ্ণেরই ছবি? পরমেশ্বরকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের দেখা সেই রূপের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে বৈদিক শাস্ত্রে; আর সে অনুসারেই তাঁর প্রতিকৃতি বা শ্রীমূর্তি নির্মাণ করা হয়।

প্রবন্ধ

দুঃখের কারণ ও সুখী হওয়ার সূত্র

বৈদিক শাস্ত্রসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে আত্মার প্রকৃত বাসস্থান নিত্যধাম চিন্ময় জগতে। উপনিষদ থেকে জানা যায় –

সকল জীব সত্তার মধ্যে একজন পরম চেতন ব্যক্তি রয়েছেন, পরমপুরুষোত্তম ভগবান। ভগবান হচ্ছেন প্রভু আর জীব তাঁর অংশ, নিত্য সেবক। প্রত্যেক জীবাত্মাকে ক্ষুদ্র স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সে তার পছন্দ অনুযায়ী ভগবানকে ভালবাসতে ও সেবা করতে পারে অথবা ভগবান থেকে স্বতন্ত্রভাবে জড় জগৎকে তথাকথিতভাবে ভোগ করার জন্য সংগ্রাম করতে পারে। সাধারণত এই জগতে জীবাত্মা দ্বিতীয়টি পছন্দ করে।

যিনি তাঁর মনকে জয় করেছেন, তাঁর মন তাঁর পরম বন্ধু। কিন্তু যিনি তা করতে অক্ষম, মনই তাঁর পরম শত্রু।

এইভাবে মনের প্রবৃত্তি সুখ বা দুঃখের কারণ হয়। মনকে একটা ধারালো ছুরির সঙ্গেও তুলনা করা যেতে পারে। ঐ ছুরির দ্বারা কাউকে হত্যা করা যায় আবার সুদক্ষ চিকিৎসক ঐ একই ছুরির সাহায্যে কারো প্রাণ রক্ষা করেন। সেক্ষেত্রে ছুরিটির কোনো দোষ নেই। কারো মন যখন নিয়ন্ত্রিত থাকে তখন তার সাহায্যে জীবনের সর্বোত্তম পূর্ণতা লাভ করা যায়। তিনি স্বেচ্ছায় পরমেশ্বর ভগবানের (যিনি হৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন) নির্দেশ অনুসারে চলেন।

ঐ ব্যক্তি জড়–অস্তিত্বের দ্বন্দ্বভাবের (যেমন সুখ, দুঃখ বা শীত, গ্রীষ্ম ইত্যাদি) দ্বারা বিচলিত হন না। সর্বদা পরমেশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অনিয়ন্ত্রিত মনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। ঐ প্রকার মন সবসময়ই বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পরিকল্পনা করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন– "ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কাম উৎপন্ন হয় এবং কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম। স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে সর্বনাশ হয়। অর্থাৎ মানুষ পুনরায় জড় জগতের অন্ধকূপে অধঃপতিত হয়।"

এইভাবে অসংযত মনই আমাদের এই জড় জগতে থাকাকালীন যাবতীয় দুর্দশার কারণ। যদি মন সংযত হয় তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি আর আমাদের বিপদে ফেলতে পারে না। বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরিচালিত করতে হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই ইন্দ্রিয়গুলি তাকে অনুসরণ করবে। রথের সারথিকে অবশ্যই দক্ষতার সঙ্গে শক্তি প্রয়োগ করে লাগামকে ধরে রাখতে হবে, যাতে ঘোড়াগুলি নিয়ন্ত্রণে থাকে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ নিয়মিতভাবে শ্রবণ করে বুদ্ধিকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

সদগুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্রচিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে বুদ্ধি আরো শক্তিশালী হবে এবং অসংযত মন অচিরেই শান্ত হবে। পারমার্থিক শাস্ত্র নির্দেশসমূহ বুদ্ধির খাদ্য স্বরূপ। ঐ সকল বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করে এবং মনকে পবিত্র করে তোলে। যখন বুদ্ধি (চালক) দক্ষ ও শক্তিশালী হয়, তখন সে মনকে (লাগাম) দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ফলে আত্মা (আরোহী) শান্তিপূর্ণ ভাবে ভ্রমণ করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ বুদ্ধি মনের থেকে দুর্বল থাকে, ততক্ষণ আমাদের জীবনে সুখ বা শান্তি কোনোটাই সম্ভব নয়।

সমস্ত সমস্যার সমাধান

যখন আমরা আমাদের প্রধান কর্তব্য ভগবানের সেবা ভুলে যাই, তখন জোর পূর্বক আমাদের হৃদয়ে কাম, ক্রোধ আদির সেবা করতে হয় যা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন আমরা ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভুলে গিয়েছি এবং তাই বৈদিক সাহিত্যে যোগ–পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে যার সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের প্রেমময়ী সম্পর্কের পুনর্জাগরণ ঘটাতে পারি। ভগবানকে লাভ করার বিভিন্ন যোগ প্রণালী রয়েছে। কিন্তু বর্তমান এই কলহ ও প্রতারণার যুগ কলিযুগে একমাত্র প্রণালী ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা। বৃহন্নারদীয় পুরাণে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে–

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা ছাড়া আর কোনো গতি নেই, আর কোনো গতি নেই, আর কোনো গতি নেই।

সৃষ্টির প্রক্রিয়া

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র চিৎ ও জড় জগৎ সৃষ্টির আদি উৎস। তাই সৃষ্টির আদি জীব তাঁর প্রার্থনা ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১) বলেছেন–

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম্॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হলেও প্রধানত ছয় প্রকার অবতারের উল্লেখ বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে।

১। পুরুষাবতার: জড় সৃষ্টি কার্য সম্পাদন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হতে ৩ জন পুরুষাবতার প্রকাশিত হন। যারা কারণোদকশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। মহাবিষ্ণুর রোম কূপ থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ডের প্রকাশ হয়। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে তিনি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন। তার দেহ থেকে নির্গত স্বেদ (ঘর্ম) বিন্দুর দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের যে অর্ধাংশ পূর্ণ হয়। সেখানে তিনি শয়ন করেন এবং তার নাভি সরোবর থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হয়, আর সেই পদ্ম থেকে সৃষ্টির প্রথম জীব ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়।

ব্রহ্মা বুঝতে পারছিলেন না কি করবেন, তখন তিনি প্রথমে দৈব শব্দ 'তপঃ' শুনতে পেলেন কিন্তু কি তপস্যা করবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। অতপর পুনরায় দৈব শব্দ ওঁ(অ+উ+ম) শব্দ শুনতে পান। তারপর ওঁ শব্দে ব্রহ্মা তপস্যা শুরু করেন। ব্রহ্মার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে দর্শন দান করেন এবং বংশীধ্বনীর মাধ্যমে বেদের জ্ঞান দান করেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মা চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করেন। সাতটি উর্ধ্বলোক– সত্যলোক, তপোলোক, জনলোক, মহর্লোক, স্বর্গলোক, ভূবর্লোক এবং ভূলোক (পৃথিবী)। সাতটি নিম্নলোক– অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল।

ব্রহ্মা তার মন থেকে প্রথমে চতুষ্কুমার এবং পরে প্রজাপতিদের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তারা সৃষ্টি কার্যে মনোযোগ না দিয়ে তপস্যায় মগ্ন হলেন। তারপর ব্রহ্মা নিজে মানব জাতির আদি পিতা মনু ও আদি মাতা শতরূপাকে সৃষ্টি করে বিবাহের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করার নির্দেশ দেন।

আরো অধিক জীব সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করায় দক্ষের তেরটি কন্যাকে কশ্যপ বিবাহ করেছিলেন। এদের মাধ্যমে দেবতা, দৈত্য, গন্ধর্ব, গো, অশ্ব, পক্ষী, মৎস্য, উদ্ভিদ ইত্যাদির জন্ম হয়।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করে দিবা, রাত্রি, কাল, ঋতু, মেঘ ও যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম সহ এভাবেই ৮৪ লক্ষ জীব প্রজাতি সৃষ্টি করলেন। আর প্রতিটি জীবের পরমাত্মা রূপে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু অবস্থান করেন।

২। লীলাবতার: ব্রহ্মার প্রতিদিন বা প্রতিকল্পে লীলা করার জন্য ভগবান যে রূপে এই জগতে আবির্ভূত হন তাই লীলাবতার। যেমন– মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি ইত্যাদি।

৩। গুণাবতার: গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে বিশ্বের পালন , সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্তে তিন গুণাবতার আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যথাক্রমে তারা রজোঃ, সত্ত্বঃ ও তমোঃ গুণের অধিশ্বর।

৪। মন্বন্তরাবতার: ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দজন মনু আবির্ভূত হয়ে রাজত্ব করেন। প্রতি মন্বন্তরে ভগবানের এক একজন অবতার আবির্ভূত হয় আর একেই মন্বন্তরাবতার বলা হয়। তারা হলেন– যজ্ঞ, বিষ্ণু, সত্যসেন ইত্যাদি।

৫। যুগাবতার: প্রতিযুগে যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্য যে অবতার আসেন তাকে যুগাবতার বলা হয়। যেমন– সত্যযুগে শুক্লাবতার, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণাবতার, দ্বাপর যুগে শ্যামবর্ণাবতার ও সাধারণ কলিতে কৃষ্ণবর্ণ অবতার।

৬। শক্ত্যাবেশ অবতার: ভগবানের শক্তি নিয়ে যে অবতার অবতীর্ণ হয়, তাকে শক্ত্যাবেশ অবতার বলা হয়। যেমন– শেষনাগ, পৃথু মহারাজ, ব্যাসদেব ইত্যাদি।

এভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন অবতারে অবতীর্ণ হয়ে বা স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে জগতের সৃজন, পালন ও সংহার করেন। তাঁর এই সৃষ্টিকার্য পরিচালনায় সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ, পবন, দুর্গা, কালী সহ বিভিন্ন দেবতারা বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। এভাবে অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও লয়প্রাপ্ত হয়।

ভক্তি কথা

তুলসী সেবা

শ্রীমতি তুলসী মহারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। তুলসীদেবী সকলের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন, তাই তাকে ভক্তিদেবী বা ভক্তিজননী বলা হয়। তিনি এ জগতে বৃক্ষরূপে পূজিত হন। তুলসী দেবীর সেবা আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তুলসীদেবীর মহিমাঃ

১. তুলসীর দর্শনে আমাদের সমস্ত পাপ ও রোগ নাশ হয়ে যায়।

২. তুলসীকে স্পর্শ করলে শরীর শুদ্ধ হয়।

৩. তুলসীতে জলদান করলে সমস্ত ভয় দূর হয়।

৪. যদি কেউ তুলসী বৃক্ষরোপণ করে, তাহলে সে কৃষ্ণচরণে ভক্তি লাভ করে।

৫. কেউ যদি ভগবানকে তুলসীপত্র অর্পণ করে, তাহলে সে সমস্ত পুষ্প, সমস্ত ফল, সমস্ত পত্র অর্পণের ফল লাভ করে।

৬. তুলসীপত্র ছাড়া কোনো ভোগ ভগবান গ্রহণ করেন না।

তুলসী সেবায় আমাদের করণীয় ও পালনীয় বিষয়াবলী:

১. প্রতিদিন তুলসীবৃক্ষে জলদান করা উচিত।

২. সকাল সন্ধ্যা তুলসীদেবীকে প্রণাম করে অন্তত ৪ বার প্রদক্ষিণ করা উচিত।

৩. প্রতিদিন (শ্রীকৃষ্ণ) ভগবানকে তুলসীপত্র বা মঞ্জরী অর্পণ করা উচিত।

৪. সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের পর এবং দ্বাদশীর দিন কখনো তুলসীপত্র চয়ন করা যাবে না।

৫. জুতা পায়ে তুলসীপত্র চয়ন করা যাবে না।

৬. স্নান না করে তুলসীপত্র চয়ন করা যাবে না।

৭. নখ দিয়ে চিমটি কেটে তুলসীপত্র ছেঁড়া যাবে না।

অতএব আমাদের সকলের বাড়িতে তুলসী বৃক্ষরোপণ করা উচিত এবং তাঁর সেবা করা উচিত।

ধৈর্য্য

ভগবান শ্রীরাম দণ্ডকারণ্যের বনে তাঁর ভ্রাতা লক্ষণ এবং পত্নী সীতার সাথে একটি খড়ের কুটিরে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করছিলেন। একদিন দুষ্ট রাক্ষস রাবণ মাতা সীতাকে অপহরণ করে জোরপূর্বক লঙ্কায় নিয়ে যায়। শ্রীরাম বানররাজ সুগ্রীব ও হনুমানের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। তারা শ্রীরামকে সীতা মাতার অনুসন্ধানে সহায়তা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সর্বত্র অনুসন্ধানের পর হনুমান ও তাঁর সঙ্গীরা মাতা সীতাকে লঙ্কায় খুঁজে পেয়েছিল। এখন শ্রীরাম তাঁর বানর সেনাসহ ভারত মহাসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে। লঙ্কার স্বর্ণনগরী আক্রমণ করার জন্য সমুদ্র অতিক্রম করতে বানর সৈন্যরা প্রস্তুত হচ্ছিল। একদিন বানর সেনারা যখন তাদের অস্ত্র প্রস্তুত করছিল, তারা উপরের আকাশে পাঁচটি বড় আসুরিক আকৃতি দেখতে পেল। সেনাদের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হল। চিৎকার শ্রবণ করে বানররাজ সুগ্রীব দ্রুত সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি উদ্বিগ্নভাবে উড়ন্ত অসুরদের দিকে তাকালেন।

সুগ্রীব ভীষণ চিন্তিত হলেন। তিনি ভেবেছিলেন, “এই রাক্ষসেরা বানরদের আক্রমণ করতে এসেছে।” তিনি হনুমানকে বললেন, “নিশ্চিতভাবে এই রাক্ষসদের কোন দুষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। চলো আমরা পাথর এবং বৃক্ষ নিয়ে দ্রুত তাদের বিনষ্ট করি।” সুগ্রীবের কথা শুনে পাঁচ রাক্ষসের নেতা আকাশ থেকে বলেছিল, “আমি বিভীষণ। আমি শ্রীরামের আশ্রয় গ্রহণ করতে এখানে এসেছি। অনুগ্রহ করে আমার আগমন সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করুন।”

পর্বতের মতো দৃশ্যমান এবং স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের মতো অভিব্যক্তিমূলক এই বিভীষণ কে? চলুন তা দেখার জন্য ইতিহাসের পাতা উল্টাই। অসুররাজ রাবণের কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ নামক দুই ভাই এবং সুর্পণখা নামক এক বোন ছিল। তাদের মধ্যে কুম্ভকর্ণ ও সুর্পণখা হিংস্রতা ও আসুরিক বিদ্যায় ছিল রাবণের সমান। কেবল কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ আসুরিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ধার্মিক এবং শুদ্ধ ছিলেন।

রাবণ যখন সীতা মাতাকে অপহরণ করেছিল, লঙ্কায় একমাত্র বিভীষণই রাবণের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল এবং তাকে দৃঢ়ভাবে দোষারোপ করেছিল। তিনি ভগবান শ্রীরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করতে ক্রমাগত রাবণকে সদুপদেশ প্রদান করেছিলেন। অবশেষে, বিভীষণের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে দুষ্ট রাবণ তাকে তার প্রাসাদ এবং রাজ্যের বাইরে নিক্ষেপ করে। এভাবে তিনি শ্রীরামকে কৃপাময় পরমেশ্বর ভগবান জেনে আশ্রয়ের জন্য তার নিকট গমন করেন।

যাহোক, সুগ্রীব তথাপি বিভীষণের প্রতি সন্দেহপরায়ণ ছিলেন এবং তিনি বিভীষণের বিরুদ্ধে রামকে সাবধান করেছিলেন। রাম সতর্কতার সাথে শ্রবণ করেছিলেন এবং তারপর অন্যান্য বানর প্রধানদের দিকে তাকিয়েছিলেন। “আপনারা সুগ্রীবের পরামর্শ শুনেছেন? আপনারা কি মনে করেন?” তাদের সকলেই সুগ্রীবের সাথে একমত হয়েছিল। সকলে অনুভব করল যে, বিভীষণকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না। রাম হনুমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার কি মত?” হনুমান উত্তর দিয়েছিল, “আমার মতে, বিভীষণ বিজ্ঞতার সাথে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, রামই সঠিক এবং রাবণ ভুল। বিভীষণ সৎ এবং তার বাক্যে এবং অভিব্যক্তিতে কোন অসততা নেই। সেজন্য আমাদের অবশ্যই তাকে গ্রহণ করা উচিত।”

অবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, ভগবান শ্রীরাম বললেন, "আমি সকলের মতামত শ্রবণ করেছি কিন্তু যে আমার শরণাগত হয়েছে আমি তাকে আশ্রয় প্রদান না করে প্রত্যাখ্যান করতে পারিনা।" এটি শ্রবণ করে সুগ্রীব আতঙ্কিত হলেন এবং পুনরায় ভগবান শ্রীরামকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, "বিভীষণ একজন অসুর এবং যেকোন সময় তার স্বভাব অনুসারে আগের মতো হয়ে যেতে পারে। অধিকন্তু, সে যদি তার নিজের ভাইকে পরিত্যাগ করতে পারে, তাহলে তাকে বন্ধু হিসেবে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি?"

এটি শ্রবণ করে ভগবান শ্রীরাম খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি বলেছিলেন,

"সকৃদেব প্রপন্নায় তবা স্মীতি ন যাচতে। অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম্ ॥"

"কেউ যদি শরণাগত হয়ে একবার বলে 'আমি আপনার হলাম' তবে আমি তাকে সম্পূর্ণ অভয় দান করি। এইটিই আমার ব্রত। বিভীষণের কি কথা এমনকি রাবণও যদি আমার কাছে আসে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব এবং আশ্রয় প্রদান করব। অনুগ্রহ করে এখনই বিভীষণকে এখানে নিয়ে আসো।"

ভগবান শ্রীরামের কথা উপস্থিত সকলের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল। চোখে অশ্রু নিয়ে সুগ্রীব বললেন, "হে প্রভু, আপনি যে এভাবে বলেছেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আপনি করুণার সাগর। আমার সন্দেহ চলে গেছে। চলুন আমাদের সকলের সমান মাত্রায় বিভীষণকে আমাদের বন্ধুত্ব উপভোগ করতে দিই।" এইভাবে, ভগবান শ্রীরাম বিভীষণকে গ্রহণ করেছিলেন। এই গল্প থেকে আমরা শিখি যে, ভগবান ক্ষমাশীল এবং সকলের জন্য পরম আশ্রয়।

প্রবন্ধ

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু

তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, "ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই, বলরাম হইল নিতাই"– প্রেমভক্তি শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ভক্তরূপে আবির্ভূত হন এবং ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত "হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র" সংকীর্তনের সূচনা করেন। ১৪০৭ শকাব্দের (১৪৮৬ ইং) ফাল্গুনী পূর্ণিমার অপরাহ্নে নবদ্বীপে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন এক মহান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাঁর আদি নিবাস ছিল সিলেটের শ্রীহট্টে। তাঁর মাতা ছিলেন শ্রীমতী শচীদেবী। শ্রীমতী শচীদেবীর গর্ভে জগন্নাথ মিশ্রের আটটি কন্যা হয়। কিন্তু খুব অল্প বয়সেই তাঁরা অপ্রকট হন। কেবল দুটি পুত্র সন্তান শ্রী বিশ্বরূপ এবং শ্রী বিশ্বম্ভর প্রকট থেকে তাঁদের পিতা মাতার স্নেহের দুলাল রূপে বর্ধিত হতে থাকেন। সর্বকনিষ্ঠ দশম সন্তান বিশ্বম্ভর পরবর্তীকালে নিমাই পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ হন। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তাঁর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন কাহিনী দিব্যলীলাময়। তাঁর জীবনের প্রথম ২৪ বছর তিনি নবদ্বীপে শৈশব এবং গার্হস্থ্য লীলা বিলাস করেন। তাঁর শৈশবলীলা ছিল আশ্চর্য্যজনক এবং মনোমুগ্ধকর। তিনি ছিলেন খুব সুদর্শন, সকলেই তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি সন্ধ্যায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। চন্দ্রগ্রহণের সময় মানুষ সাধারণত গঙ্গা অথবা অন্য কোনো পবিত্র নদীতে গিয়ে স্নান করে এবং জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে। মহাপ্রভু যখন চন্দ্রগ্রহণের সময় জন্মগ্রহণ করলেন, তখন সমস্ত ভারতবর্ষ "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্রের কীর্তনে মুখর হয়ে উঠেছিল।

"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র" হলো কলিযুগের পাবনকারী তারকব্রহ্ম নাম।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শৈশব লীলাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা নিম্নরূপঃ

ছয় মাস বয়সে তাঁর অন্নপ্রাশনের সময় মহাপ্রভু তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

এই বৈদিক অনুষ্ঠানে শিশুর ভবিষ্যৎ প্রবৃত্তি কেমন হবে, সেটি জানার জন্য মুদ্রা এবং গ্রন্থ দেওয়া হয়। মহাপ্রভু মুদ্রা গ্রহণ না করে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রহণ করেছিলেন।

একটি ছোট শিশুরূপে তিনি যখন উঠানে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলেন, তখন একদিন একটি সাপ সেখানে এসে উপস্থিত হলো এবং তিনি সেই সাপটির সঙ্গে খেলা করতে লাগলেন। পরিবারের সকলে সেই দৃশ্য দেখে ভয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর সাপটি চলে গেলে তাঁর মাতা তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন।

একবার একটি চোর তাঁর গায়ের গয়না চুরি করার জন্য তাকে চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু তিনি খুব মজা করে সেই চোরের কাঁধে ঘুরে বেড়ালেন। সেই চোরটি তার গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলে নেওয়ার জন্য নির্জন জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে ঠিক মহাপ্রভুর বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলো। শিশুকে ফিরে পেয়ে সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বয়স যখন মাত্র ১৬ বছর তখন তিনি চতুষ্পাঠী খুলে শিক্ষা দান করতে শুরু করেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে ছিলেন একজন মহান পণ্ডিত। তাঁকে পড়াশোনার বিষয়ে কেউ কখনো হারাতে পারেনি। তিনি গঙ্গায় যখন স্নান করতেন তখন এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে গিয়ে যে কাউকে ব্যাকরণ, গণিত, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন।

নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা সব সময় তাঁর পাণ্ডিত্যের ভয়ে ভীত থাকতেন। তাঁর প্রীতি সাধনের জন্য শ্রীল জীব গোস্বামী 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ' রচনা করেন। যা এখনো পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এ সময়কালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরি নামে কাশ্মীরের এক মহাপণ্ডিত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিষয়ে তর্ক করার জন্য নবদ্বীপে আসেন। মহাপ্রভু তাঁকে নিখুঁত শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা পরাজিত করেন। এভাবে তিনি তাঁর শৈশবলীলা অতিবাহিত করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ২৪ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে জগন্নাথ পুরীতে ছিলেন। তাঁর পার্ষদবর্গের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভু, হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস ঠাকুর, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, ষড় গোস্বামী, শ্রীধর পণ্ডিত ছিলেন অন্যতম। সন্ন্যাস গ্রহণের পর সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রায় রামানন্দ, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সাথে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয় এবং তাদের তিনি কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা নিয়ে লোচন দাস ঠাকুর "চৈতন্য মঙ্গল", বৃন্দাবন দাস ঠাকুর "শ্রীচৈতন্য ভাগবত" এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" রচনা করেন।

১৪৫৫ শকাব্দে (১৫৩৩ ইং) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে ৪৮ বছর বয়সে শ্রীশ্রী জগন্নাথ পুরীতে অপ্রকট হন।

ইস্‌কন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) গৌড়ীয়–বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম একটি শাখা। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইস্কন পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার করে চলেছে। শ্রীচৈতন্যদেব জগদ্বাসীকে কৃষ্ণভক্তির বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি কলিযুগের যুগধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা প্রচার করেছিলেন:

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।

পৃথিবীব্যাপী সমস্ত নগরাদি গ্রামে ভগবানের এই দিব্যনাম প্রচারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যেই ইস্‌কন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ ইস্‌কন স্থাপন করেছিলেন যাতে সংঘে যোগদানকারী প্রত্যেকেই পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পেতে পারে। তাই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে গুরু–পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত শিক্ষা অনুযায়ী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য রচনা করে গেছেন। তাঁর এই অসামান্য অবদানের জন্য আজ কৃষ্ণভাবনামৃতের সংস্পর্শে এসে অগণিত মানুষ ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে শাশ্বত শান্তির সন্ধান পেয়েছেন।

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও বিস্তার

১৯৬৬ সালের ১৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটনের ২৬ নং সেকেন্ড অ্যাভিনিউতে ছোট একটি দোকান ঘর 'ম্যাচলেস গিফট' এ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক ইস্‌কন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দাপ্তরিকভাবে এখানে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯২২ সালে এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামীর সাথে তার গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের প্রথম সাক্ষাতে প্রাপ্ত পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করার আদেশই ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত এবং পরবর্তী ৪০ বছর ধরে তিনি সেই আজ্ঞা পালনে কাজ করেন।

১৯৫৩ সালে ভারতের ঝাঁসিতে তিনি 'ভক্তসঙ্গ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার ৭টি উদ্দেশ্যই তিনি পরবর্তীতে ইস্‌কনের ৭টি উদ্দেশ্য হিসেবে প্রণয়ন করেন। তারপর ১৯৬৫ সালে আমেরিকা পৌঁছানোর পর দীর্ঘ এক বছর কঠোর সংগ্রামের পর তিনি ইস্‌কন প্রতিষ্ঠা করেন।

এরপর ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে কানাডা, ইউরোপ, মেক্সিকো, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ভারতে একাধিক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭০ সালে প্রভুপাদ ইস্‌কন পরিচালনার জন্য 'জি.বি.সি. (গভর্নিং বডি কমিশন)' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭০ সালে ভারতে ফিরে আসেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে ভারতের বৃন্দাবন, মায়াপুর ও মুম্বাইতে তিনটি বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৭২ সালে প্রভুপাদ কর্তৃক ইস্‌কনের গ্রন্থ প্রকাশনা সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট (বি.বি.টি)' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বর্তমানে বিশ্বের আধ্যাত্মিক গ্রন্থ প্রকাশের অন্যতম একটি বৃহৎ প্রকাশক সংস্থা।

১৯৭৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক 'ভক্তিবেদান্ত চ্যারিটি ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠিত হয় যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তার পার্ষদবর্গের লীলাভূমি তথা গৌড়মণ্ডল ভূমির উন্নয়ন ও সংস্কারে অর্থসংস্থান করে।

বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী ইস্‌কনের ৮০০টিরও বেশি মন্দির রয়েছে। এছাড়াও ৭০ এর অধিক গোশালা, খামার ও ইকোভিলেজ আছে।

ইস্‌কনের ৭টি উদ্দেশ্য

১. সুসংবদ্ধভাবে মানবসমাজে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করা এবং সমস্ত মানুষকে পারমার্থিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত হতে শিক্ষা দেওয়া, যার ফলে জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভ্রান্তি প্রতিহত হবে এবং জগতে যথার্থ সাম্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

২. শ্রীমদ্ভগবদগীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করা।

৩. সংস্থার সমস্ত সদস্যদের পরস্পরের কাছে টেনে আনা এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে টেনে আনা এবং এইভাবে প্রতিটি সদস্য চিত্তে এমনকি প্রতিটি মানুষের চিত্তে সেই ভাবনার উদয় করানো, যাতে সে উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ।

৪. শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত সমবেতভাবে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার যে সংকীর্তন আন্দোলন, সে সম্বন্ধে সকলকে শিক্ষা দেওয়া ও অনুপ্রাণিত করা।

৫. সংস্থার সদস্যদের জন্য এবং সমস্ত সমাজের জন্য পবিত্র স্থান নির্মাণ করা যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার নিত্যলীলা–বিলাস করবেন এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তা নিবেদিত হবে।

৬. একটি সরল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবনধারা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সদস্যদের পরস্পরের কাছে টেনে আনা।

৭. পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ সাধন করার জন্য সাময়িক পত্রিকা, গ্রন্থ ও অন্যান্য লেখা প্রকাশ করা ও বিতরণ করা।

বৈদিক শিক্ষা প্রসারে ইস্‌কনের অনবদ্য পদক্ষেপ

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ৭টি উদ্দেশ্যের মধ্যে ৪টিতেই শিক্ষা শব্দটির সরাসরি উল্লেখ রয়েছে এবং বাকিগুলোও কোন না কোনোভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত । শ্রীল প্রভুপাদের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ইস্‌কনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ এবং অর্জন সমূহ দেখে নেওয়া যাক।

গুরুকুল ও স্কুল সমূহের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান

ইস্‌কন পরিচালিত গুরুকুলসমূহে একাডেমিক শিক্ষা ও বৈদিক শিক্ষার সমন্বয় করে পাঠদান করা হয়। এখানে যেমন বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, কলাবিদ্যা ইত্যাদি নিয়ে শিক্ষাদান করা হয় তেমনি শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্রীমদ্ভাগবতম, রামায়ণ, মহাভারত আদি বৈদিক শিক্ষাও দেওয়া হয়।

১৯৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর শ্রীল প্রভুপাদের হাত ধরে ডালাসে ইস্‌কনের প্রথম গুরুকুল স্থাপিত হয়। এরপর টেক্সাস, মায়াপুর, বৃন্দাবনসহ বিভিন্ন বড় বড় শহরে ইস্‌কনের ১৫টিরও অধিক গুরুকুল রয়েছে। গুরুকুলের পাশাপাশি ভক্তিবেদান্ত স্কুল, ভক্তিবেদান্ত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ভক্তিবেদান্ত একাডেমি এরকম বিভিন্ন নামে মায়াপুরসহ ভারতের বিভিন্ন শহরে, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়াসহ বড় বড় দেশে এমনকি বাংলাদেশেও কয়েকটি স্কুল রয়েছে।

বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ভক্তি কোর্সসমূহ

ভক্তিমূলক কোর্স যেমন– ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবৈভব, ভক্তিবেদান্ত, ভক্তি সার্বভৌম, স্পিরিচুয়াল সায়েন্টিস্ট, ডিসকভার ইয়োরসেল্ফ, আধ্যাত্মিক রহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, ইস্‌কন শিষ্য প্রশিক্ষণ কোর্স আদি বিভিন্ন কোর্স প্রদান করে থাকে। মায়াপুর ইনস্টিটিউট, ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট, গোবর্ধন ইনস্টিটিউট ইত্যাদির মাধ্যমে কোর্সগুলি পরিচালিত হয়, যেখান থেকে বৈদিক শিক্ষায় নিজেকে সমৃদ্ধশালী করার সুযোগ রয়েছে।

প্রশিক্ষণ মূলক কোর্স

ইস্‌কন ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, দ্বন্দ্ব নিরসন, পারিবারিক জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োগ, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট আদি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। যেমন– Leadership Course, জিবিসি ট্রেনিং, গুরু ট্রেনিং, পূজারী কোর্স, অর্চন কোর্স ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকল্প

ইস্‌কনে “ইকোভিলেজ”, “Gita Valley” এর মতো কিছু প্রকল্প রয়েছে যেগুলোও শিক্ষা প্রসারণে ভূমিকা রাখছে। যেমন– ভারতের মহারাষ্ট্রে অবস্থিত “গোবর্ধন ইকোভিলেজ”, যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ায় “গীতানগরী” যেটি বর্তমানে “Gita Valley” নামে পরিচিত, ভারতের মহারাষ্ট্রে “নীলাচল বৈদিক ভিলেজ”, আমেরিকার ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় “নিউ বৃন্দাবন”, নিউজিল্যান্ডে “নিউ বর্ষাণা”, মায়াপুর “বৈদিক ভিলেজ ও খামার” ইত্যাদি অন্যতম।

বই প্রকাশনা ও প্রচার

শ্রীল প্রভুপাদের রচিত ৮০টিরও বেশি গ্রন্থসমূহ, বিভিন্ন আচার্যবৃন্দদের গ্রন্থ ও বৈদিক গ্রন্থসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত করে চলেছে “ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট”। এই গ্রন্থসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচারের মাধ্যমে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে।

১৯৬৬ সালের পর অদ্যাবধি এই প্রকাশনার মাধ্যমে প্রায় ৬০ কোটিরও বেশি ধর্ম ও নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থ বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইস্‌কনের অর্জনসমূহ

- ২০১৭ সালে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা UNWTO কর্তৃক বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হয় ইস্‌কনের ইকোভিলেজ প্রকল্পকে।
- ২৪ নভেম্বর, ২০১৪ সালে নাইজেরিয়ার লাগোসে খাদ্য বিতরণ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইস্‌কনকে “সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি অ্যাওয়ার্ডস (SISA) – ২০২৪” এ ভূষিত করে।
- পৃথিবীর প্রায় ৮০টি ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ এর প্রকাশ এবং ১০৮টি ভাষায় এর ভূমিকা অনুবাদ করা হয়।
- “Sri Mayapur International School” যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

- নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রসারে ইস্‌কনের একটি উদ্যোগ Value Education Olympiad জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত হয়।

আন্তর্জাতিক পরিসরে ইস্‌কনের কার্যক্রম

বর্তমান বিশ্বের প্রায় ১৫০টিরও বেশি দেশে বিস্তৃত ইস্‌কন একটি সুসংগঠিত ধর্মীয় আন্দোলন হলেও এটির কার্যক্রম শুধু ধর্মীয় প্রচারণায় সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, সংস্কৃতি, পরিবেশ এবং সামাজিক উন্নয়নকে একত্রিত করে একটি সমন্বিত আধ্যাত্মিক–সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন দেশে ইস্‌কনের কার্যক্রম ঐ দেশের আইন, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং সামাজিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত হয়, যার কারণে বিশ্বব্যাপী ইস্‌কনের প্রচার এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। চিলি থেকে রাশিয়া, নিউজিল্যান্ড থেকে কানাডা পৃথিবীর কোণে কোণে মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন জনপ্রিয়ভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ইস্‌কন

নিউইয়র্কের টম্পকিন্স স্কোয়ার পার্কে একটি বৃক্ষের নিচে এক বাঙালি শিক্ষিত সন্ন্যাসীর করতাল বাজিয়ে প্রকাশ্যে সংকীর্তন করার মাধ্যমেই জনসম্মুখে ইস্‌কনের প্রচারের পথচলা শুরু হয়েছিল। তারপর নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকো, লস এঞ্জেলসসহ আমেরিকার সব বড় শহরসহ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মিলে প্রায় ১৫০টির মতো কেন্দ্র রয়েছে ইস্‌কনের, এছাড়াও আছে অনেক ইকোভিলেজ ও কৃষি খামার প্রকল্প, বড় বড় নিরামিষ রেস্তোরাঁ।

ইউরোপ মহাদেশে ইস্‌কন

এ মহাদেশে ইস্‌কনের ২০০ এরও অধিক মন্দির ও নামহট্ট কেন্দ্র রয়েছে। ১৯৬৮ সালে প্রভুপাদের তিন শিষ্য দম্পত্তির দ্বারা লন্ডনে প্রথম ইউরোপের প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়। তৎকালীন জনপ্রিয় ব্যান্ড বিটলসের কিংবদন্তী শিল্পী জর্জ হ্যারিসন ইস্‌কনের 'হরেকৃষ্ণ আন্দোলন'–এ মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিজ বাড়িটি দান করেন। যেটি 'ভক্তিবেদান্ত ম্যানর' নামে পরিচিত এবং বর্তমান ইউরোপের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক তীর্থস্থান ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। লন্ডনের রথযাত্রা প্রতি বছর 'ট্রাফালগার স্কয়ারে' অনুষ্ঠিত হয় যেখানে লাখ লাখ ব্রিটিশ ও পর্যটকেরা অংশ নেয়।

লন্ডন ছাড়াও জার্মানির বার্লিন, হামবুর্গ, ফ্রান্সের প্যারিসে, ইতালির রোম ও মিলানে, স্পেন, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ডসহ সব দেশেরই বড় বড় শহরে ইস্‌কনের কেন্দ্র রয়েছে যেখানে সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ, রেস্টুরেন্ট, ভক্তিমূলক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্ট্রিট হরিনাম সংকীর্তন, রথযাত্রা আদি উৎসবের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম চলছে।

আফ্রিকা মহাদেশে ইস্‌কন

১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমে আফ্রিকায় ইস্‌কনের প্রচার শুরু হয়। ডারবানে অবস্থিত 'শ্রীশ্রী রাধা রাধানাথ মন্দির' যেটি 'টেম্পল অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং' নামে পরিচিত বর্তমানে এই মহাদেশের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক ও পর্যটন ল্যান্ডমার্ক।

দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও নাইজেরিয়া, কেনিয়া, মরিশাস, ঘানা, উগান্ডা, তানজানিয়াসহ অন্যান্য দেশে

ইস্কন তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রদের আস্থার প্রতীক হয়েছে উঠেছে, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে বিনামূল্যে সুস্বাদু খাবার বিতরণ করা হয়।

ওশেনিয়ায় ইস্কন

এই মহাদেশে ইস্কনের কার্যক্রম সুসংগঠিত, আধুনিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে অভিযোজিত। ১৯৭১ সালে শ্রীল প্রভুপাদ অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে যান, সেখানে ছোট একটি কেন্দ্রের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই যাত্রা আজ দেশটির প্রতিটি প্রধান শহরে (যেমন মেলবোর্ন, ব্রিসবেন) বিশাল মন্দির ও কমিউনিটি সেন্টার তৈরির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও নিউজিল্যান্ড ও ফিজির মতো দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে ইস্কনের প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

নিউ সাউথ ওয়েলসের 'নিউ গোবর্ধন ফার্ম' প্রকল্পটি বিশাল অঞ্চল জুড়ে গোশালা ও পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজের মাধ্যমে 'Simple Living & High Thinking' আদর্শের বাস্তবায়ন করছে।

এশিয়া মহাদেশে ইস্কন

১৯৭০ সালে প্রভুপাদের ভারতে ফিরে আসার মধ্য দিয়েই এশিয়ায় ইস্কনের প্রচার শুরু হয়। এশিয়ায় বর্তমানে প্রায় ৪০০ এর মতো কেন্দ্র রয়েছে । এশিয়ার প্রায় সব দেশেই ইস্কনের মন্দির বা কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশেই বেশি কেন্দ্র রয়েছে। ভারতের মায়াপুরে অবস্থিত 'মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির' এবং নির্মাণাধীন 'টেম্পল অব বৈদিক প্ল্যানেটেরিয়াম' (TOVP) ইস্কনের প্রধান আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। এছাড়া মুম্বাইয়ের জুহুর হরেকৃষ্ণল্যান্ডে 'শ্রীশ্রী রাধা রাসবিহারী মন্দির', বৃন্দাবনে 'শ্রীশ্রী কৃষ্ণ বলরাম মন্দির' এবং কলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, পুনে, নাসিক, হায়দ্রাবাদসহ বড় বড় সব শহরে দৃষ্টিনন্দন মন্দির রয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ অন্যান্য দেশগুলিতে ইস্কনের অনেক কেন্দ্র রয়েছে। চীন, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য অনেক দেশেই ইস্কনের মন্দির ও কেন্দ্র রয়েছে।

বাংলাদেশে ইস্কন

প্রতিষ্ঠা ও প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ইস্কনের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৮ সালের দিকে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রথম থেকে চাইছিলেন বাংলাদেশে ইস্কনের প্রচার হোক। ব্যস্ততার কারণে তিনি নিজে না আসতে পারলেও তাঁর বরিষ্ঠ শিষ্যদের বাংলাদেশে প্রচারের জন্য বিশেষ আদেশ দিয়েছিলেন।

কার্যক্রম

বিশ্বের অন্যান্য দেশের কার্যক্রমের মতো বাংলাদেশেও ইস্কনের সকল কার্যক্রম রয়েছে। সুন্দর সুন্দর মন্দির স্থাপনা সেখানে সার্বক্ষণিক ভগবানের সেবা পূজা করা, হরিনাম সংকীর্তন করা ও প্রচার করা, গ্রন্থ অধ্যয়ন, প্রকাশনা ও প্রচার করা, সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ করা ইস্কনের মূল কার্যক্রম। এছাড়াও রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী আদি উৎসব আয়োজন করা। ঢাকার রথযাত্রা বিশ্বে অন্যতম।

এর বাইরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ করা, আর্থিক সহযোগিতা করা, ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বাড়ি মেরামত করে দেওয়াসহ বিভিন্ন জনসেবামূলক কার্যক্রমের সাথে ইস্কন সম্পৃক্ত রয়েছে। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইস্কন পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেগুলিতে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বৈদিক শিক্ষায় ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ইনিস্টিটিউটের মাধ্যমে ভক্তিশাস্ত্রী আদি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

বাংলা ভাষা বিশ্বায়নে ইস্কনের ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষা গুলির মধ্যে বাংলা ভাষার অবস্থান মাতৃভাষার দিক দিয়ে ৫ম এবং মোট ব্যবহারকারী ভাষার দিক দিয়ে ৭ম বৃহত্তম ভাষা।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মাতৃভাষা বাংলা এবং এছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা, আসাম, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, মেঘালয়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর বাংলাভাষী মানুষ বাস করে। ভারতের ২য় ব্যবহারকারী ভাষা বাংলা, সিয়েরা লিওনে অন্যতম সম্মানসূচক সরকারি ভাষা বাংলা। মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য একমাত্র বাঙ্গালিদেরই প্রাণ বিসর্জনের ইতিহাস রয়েছে। অসংখ্য কবি সাহিত্যিকদের সুন্দর লেখনীর দ্বারা বাংলা ভাষার সাহিত্য ভাণ্ডারও অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী।

সেই বাংলা ভাষারই অন্যতম ব্যক্তিত্ব শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬–১৫৩৩খ্রি.) যিনি একাধারে সমাজ সংস্কারক এবং প্রেমধর্মের প্রচারক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়ে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, বৈষম্যে জর্জরিত এই বঙ্গ ভূমিতে বৈষ্ণব দর্শনের দ্বারা সাম্যবাদের বাণী প্রচার করে অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী, প্রেম ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তাকে নিয়েই বাংলা সাহিত্যের একটি যুগ "চৈতন্যযুগ (১৫০০–১৭০০খ্রিঃ)" সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের "চৈতন্যমঙ্গল", মুরারীগুপ্তের কড়চা, বৃন্দাবন দাসের "শ্রীচৈতন্য ভাগবত", নরহরি সরকারের "শ্রীভক্তিরত্নাকর" এবং নরোত্তম দাস ঠাকুরের রচিত "বাংলা গীতাবলী" এসবই চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করেই রচিত।

ইস্কনের মূল ভিত্তি হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের দর্শন। এর মধ্যে তিনি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন যা বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষার এক বিপ্লব সৃষ্টি করে। এই গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ ও শিক্ষা প্রচারিত হচ্ছে। মহাপ্রভুর শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ এখন বাংলা ভাষা শিখছে। শুধু চৈতন্যচরিতামৃতই নয় শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমূহ, নরোত্তম দাস ঠাকুরের রচনাবলী ও অন্যান্য বাংলা গ্রন্থসমূহ প্রভুপাদের সুযোগ্য শিষ্যগণ কর্তৃক জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ানসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার ফলে বাংলা ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ ক্রমশ বাড়ছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইস্কন মন্দিরগুলোতে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার সকল মন্দিরে সকাল সন্ধ্যা বাংলা ভাষায় আরতি কীর্তন গাওয়া হয়। কৃষ্ণাঙ্গ–শ্বেতাঙ্গ সকলেই বাংলা ভাষায় কীর্তন গাইছে, নৃত্য করছে, ভজন শিখছে , গ্রন্থ পাঠ করছে যার ফলে বাংলার ব্যবহার বাড়ছে। ২০১৫ সালে কলকাতার নেতাজি স্টেডিয়ামে ইস্কন কর্তৃক বিশ্বের ১০৫ টি দেশের ভক্তবৃন্দদের নিয়ে সমবেতভাবে বৈষ্ণব কবি নরোত্তম দাস ঠাকুরের বাংলায় রচিত গুরুবন্দনা "শ্রীগুরুচরণপদ্ম" পরিবেশন করা হয় যা "গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে" স্থান করে নেয়। ইস্কনের এই উদ্যোগ বাংলা ভাষা বিশ্বায়নে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

ইস্‌কনের বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম

ইস্‌কন শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় সংগঠন নয়; এটি একটি বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কাযর্ক্রম, যা মানবকল্যাণ, নৈতিকতা এবং সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইস্‌কন শিক্ষা, খাদ্য সহায়তা, পরিবেশ রক্ষা, নৈতিক উন্নয়ন এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সামাজিক ভূমিকা পালন করে আসছে তেমন কিছু উদ্যোগ হলো– খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি। প্রকল্পটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ উদ্ভিদভিত্তিক বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম হিসেবে পরিচিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধের মতো সংকটময় সময়েও এই স্বেচ্ছাসেবী প্রকল্পটি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে; যেমন—কেরালার ভয়াবহ ভূমিধসের সময়, নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্প থেকে শুরু করে বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত বন্যা, রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ ইত্যাদি কঠিন সময়ে স্থানীয় ইস্‌কন ভক্তরা ক্ষতিগ্রস্ত ও উদ্ধারকর্মীদের জন্য দ্রুত গরম ও পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দিয়েছেন।

ইস্‌কনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষুধার্ত শিশুদের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে এই মহৎ উদ্যোগটি শুরু করেছিলেন, যা আজ বিশ্বব্যাপী অসংখ্য মানুষের কাছে আশার আলো হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যে কেউ এই মানবিক প্রচেষ্টায় অনুদান বা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুক্ত হতে পারেন। এটি ইস্‌কনের সবচেয়ে বড় এবং বিশ্ববিখ্যাত সামাজিক প্রকল্প। বিশ্বের প্রায় ৬০টিরও বেশি দেশে এই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়। ইস্‌কন পরিচালিত ট্রাইবাল কেয়ার কর্মসূচি মূলত আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কাজ করে।

মাদকমুক্তি অভিযান

ইস্‌কনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উদ্যোগ হলো মাদকমুক্ত সমাজ গঠন। শ্রীল প্রভুপাদ তরুণদের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে একটি শৃঙ্খলিত জীবনধারা প্রচার করেন। এই কর্মসূচি চারটি মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে—মাদক ও অ্যালকোহল বর্জন, মাংসাহার পরিহার, অবৈধ যৌনাচার থেকে বিরত থাকা এবং জুয়া পরিত্যাগ।

ইস্‌কনের সাথে যুক্ত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ

বিশ্বজুড়ে শিল্প, সংস্কৃতি এবং ব্যবসার জগতের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ইস্‌কনের দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং এর প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

জর্জ হ্যারিসন: জর্জ হ্যারিসন ইস্‌কনের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ১৯৭৩ সালে লন্ডনের নিকটে তাঁর নিজ বাড়িটি দান করেন, যা পরবর্তীতে ‘ভক্তিবেদান্ত ম্যানর’ হিসেবে পরিচিতি পায়। ‘My Sweet Lord’ তার বিখ্যাত গান যা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে এবং তিনি শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশে অর্থ সহায়তা করতেন। জর্জ হ্যারিসন ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলমান সময়ে সহায়তা করতে ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ আয়োজন করেন এবং তা থেকে সংগ্রহীত অর্থ বাংলার শরণার্থীদের সহায়তায় প্রদান করেন।

আলফ্রেড ফোর্ড: আলফ্রেড ফোর্ড হলেন ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র। তিনি ১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তার নাম হয় অম্বরীশ দাস। তিনি

হাওয়াইতে মন্দির নির্মাণে সহযোগিতা করেন। তিনি বর্তমানে মায়াপুরে বৈদিক প্লানেটেরিয়াম (TOVP) নির্মাণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

স্টিভ জবস (অ্যাপল এর প্রতিষ্ঠাতা): স্টিভ জবস তাঁর ছাত্র জীবনে পোর্টল্যান্ড থাকাকালীন সময়ে খাবারের জন্য নিয়মিত স্থানীয় ইস্‌কন মন্দিরে যেতেন। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভগবদগীতার দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

বিশিষ্টজনের দৃষ্টিতে ইস্‌কন

শ্রীল প্রভুপাদ যে গৃহ নির্মাণ করেছেন সেখানে সারা পৃথিবীর মানুষ আশ্রয় পেতে পারে"।

–ড.এম.এন ব্যাশাম

"শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এক অমূল্য কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। মানব–সমাজের মুক্তির জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো এক অনবদ্য অবদান।"

–শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

"আমি শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি সারা বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত ও মানবতার বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। ইস্‌কন আজ বিশ্বজুড়ে সেবা, খাদ্য বিতরণ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় বড় ভূমিকা রাখছে।"

–প্রণব মুখার্জি, সাবেক রাষ্ট্রপতি, ভারত

"আমি প্রভুপাদের বিনয়, নম্রতা ও সরলতা খুব পছন্দ করতাম। তাঁর অর্জন ও সাহিত্যকর্ম সত্যিই বিস্ময়কর ও বিশাল। তিনি অল্প বিশ্রাম নিয়ে অসাধারণ পরিশ্রম করতেন, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কৃষ্ণভাবনামৃত বিশ্বজুড়ে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে।"

–জর্জ হ্যারিসন, কিংবদন্তী বিটলস সংগীতশিল্পী

"শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা আমার জীবন বদলে দিয়েছে। আমি ইস্‌কনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝেছি। প্রভুপাদের শিক্ষা আমাকে ভক্তি ও সেবার পথে এনেছে। কৃষ্ণভাবনামৃত মানুষের জীবনকে সুন্দরভাবে পরিবর্তন করতে পারে।"

–আলফ্রেড ফোর্ড, হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র, ফোর্ড মোটর কোম্পানির অন্যতম বোর্ড পরিচালক

“হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মানুষের চেতনাকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করে। এই মহামন্ত্রের আধ্যাত্মিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। ইস্কনের কীর্তন পশ্চিমা বিশ্বেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। ভক্তিমূলক সঙ্গীত মানুষের অন্তরে পরিবর্তন আনে।”

–অ্যালেন গিনসবার্গ, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী মার্কিন কবি, লেখক এবং ‘প্রতি–সংস্কৃতি’ আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব

“হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের সংগীত ও আধ্যাত্মিকতা আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। আমি ইস্কনের কীর্তন ও ভক্তিমূলক সংস্কৃতি পছন্দ করি। এই আন্দোলন মানুষের মনে আনন্দ ও শান্তি আনে। আধ্যাত্মিক সংগীত মানুষের হৃদয়কে বদলে দিতে পারে।”

–বয় জর্জ (Boy George), বিখ্যাত পপ গায়ক

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।”

–পণ্ডিত রবি শঙ্কর, বিখ্যাত সংগীতশিল্পী

জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

জাগ্রত ছাত্র সমাজ

লক্ষ্য: (Our Vision)

» শিক্ষার্থীদের পারমার্থিক জীবন প্রণালী প্রদানের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা। (Protection)
» পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা। (Art of Parenting)
» সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গঠনে ভূমিকা পালন করা। (Social Structure)
» যথাযথ জ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা। (Social Service)
» পারমার্থিক চেতনাসম্পন্ন নেতৃত্ব প্রদানকারী যোগ্য মানুষ তৈরি করা। (Spiritual Leadership)

উদ্দেশ্য: (Our Mission)

» শিক্ষার্থীদের গীতার জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত করানো। (Spiritual Knowledge)
» সনাতন ধর্ম, বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মানব জীবন সার্থক করা। (Religion & Vedic Culture)
» মূল্যবোধ সম্পন্ন চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিশুদের তৈরি করে তোলা। (Honest Personality)
» পারস্পরিক সহযোগিতা ও সু-সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্ব-চেতনা বোধ ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলা। (Mutual Relationship)
» শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ আন্দোলন প্রচার ও প্রসারকে সুগঠিত করা। (Spreading Hare Krishna Movement of Lord Caitanya)
» ভগবৎ কেন্দ্রিক আদর্শ জীবন প্রণালী অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা। (Spritual Life-style)
» দিব্য আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। (Chaitanya Brotherhood)
» প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের যোগ্যতা অর্জনের জন্য গড়ে তোলা। (Preaching)

কার্যক্রম: (Our Activities)

» কোর্স-সিলেবাস ভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থা (Course Based Academic System)
» ব্যবহারিক বিষয়ে (সদাচার) শিক্ষাদান (Practical)
» সংগীত, চিত্রাংকন ও বাদ্যযন্ত্র প্রশিক্ষণ (Music, Art & Entertainments Training)
» উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ছাত্র ও অভিভাবক সম্মেলন (Uttisthata Jagrata Students & Parents Council)
» ভক্তিবেদান্ত মেগা কনটেস্ট (Bhaktivedanta Mega Contest)
» বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (Annual Cultural Competition)
» ভক্তিবেদান্ত স্কলারশীপ (Bhaktivedanta Scholarship)
» অভিভাবক কাউন্সেলিং (Parents Counseling)
» শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (Teachers Training Course)
» পারমার্থিক শিক্ষা সফর (Spiritual Study Tour)
» গ্রন্থ প্রকাশনা ও বিতরণ (Book Printing & Distribution)